জন্ম — ১৩০৬ মৃত্যু — ১৩৩৫



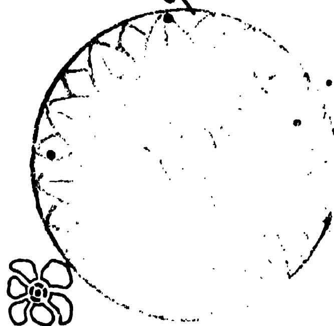
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার

প্রতিষ্ঠাতা
"দেব-সাহিত্য-কুটীর"

গিয়েও তুমি যাওনি চলে আছ মোদের কাছে
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কাষ্য তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের উন্নতি হো'ক তোমার আশীষ নিয়ে।

সচিত্র নূতন সংস্করণ

আবার তোরা মানুষ হ'



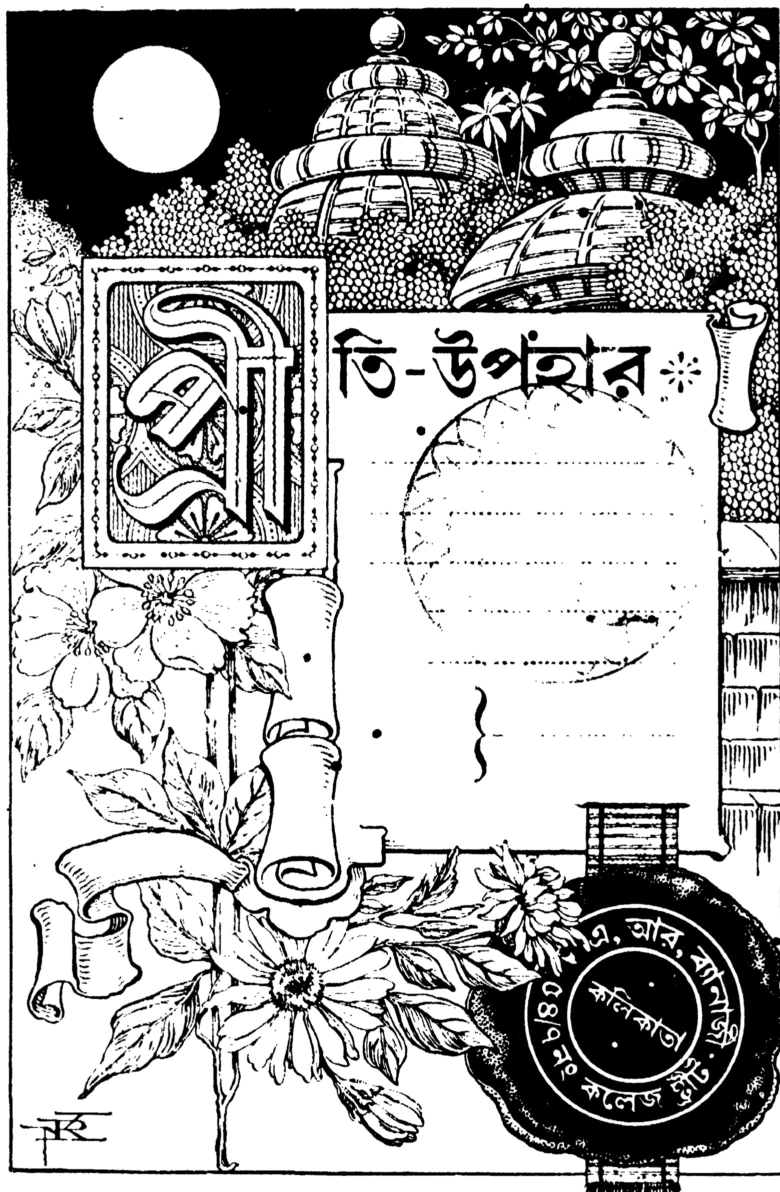
শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়,
পরিচালক—"দেব-সাহিত্য-কুটীর",
৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৭

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার।
"বি, পি, এম্‌স্ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।


প্রীতি-উপহার
এ, আর, ব্যানার্জী
৩৪/৭নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

"ঘুচাতে চাস্ যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগিয়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যারে আত্মপর পরকে নিয়ে আপন কর্,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ' ।"

[দ্বিজেন্দ্রলাল]

আবার ভোলা মানুষ

(১)

ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের ওপর পাঁচ পাঁচ খানা লোহার দোকান, গ্রে-ষ্ট্রীটের ওপর আধ ডজন মিস্ত্রির কারখানা, আর ক'লকাতা সহরের অলিতে-গলিতে বড় ছোট বিস্তর বাড়ী,...অনেক টাকার সম্পত্তি।

ভোগ করবার লোক বুড়ো নিজে, আর তেইশ বছরের মেয়ে মেনকা।

মেনকার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন থেকে তার স্বামী উমাচরণ নিরুদ্দেশ। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তার সন্ধান মেলেনি।

বুড়োর নাম ভবতোষ বোস্। ত্রিশ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে ক'লকাতায় এসেচে,—আজ পঁচিশ বছরের মধ্যে একবারও সে দিকে ফিরে তাকায় নি।

মেনকার স্বামী যেবার না ব'লে কোথায় চ'লে গেল, তার ফিরে বছর গিন্নী মারা গেলেন। সেও আজ অনেক কালের কথা।...মেয়েটি ছাড়া আর সংসারে আপন ব'লতে কেউ নেই; বুড়ো—তাই মেনকার কথায় ওঠে-বসে।

ষাটের কাছাকাছি বয়স হ'লে কি হবে, ভবতোষ কিন্তু এখনো তার দোকানের আর কারখানার কাজ কর্ম্ম ফি দিনই দেখা শুনো করে।

দশটা এগারোটায় বেরোয়, ফিরে আসতে রাত আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়।...

সোফার মোটর নিয়ে গেটের সুমুখে অপেক্ষা করছিল।

আজ ভবতোষ দেরী করে ফেলেচে। খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে করতে চোখ দুটো এঁটে এসেছিল।...

বেলা বারোটা...গেটে সোফার ভোঁক্ ভোঁক্ ক'রে হর্ণ বাজাচ্ছিল। এই রকমভাবে ঘুম ভাঙাতে তার মনিবের নাকি হুকুম আছে।...

বেরুতে যাচ্ছে, মেনকা এসে ব'ললে—দেড় লাখ টাকার চেক্ দিয়েছ? কিন্তু এ কেন বাবা?

তাড়াতাড়ির সময়, ভবতোষ যেতে যেতে ব'লে গেল—জানিস মা, থিয়েটারের পয়সায় অনেকে পাঁচ দশ লাখ টাকা কামিয়ে নিয়েছে, বেশ লাভের ব্যবসা।...

বাপ চ'লে গেলে মেয়ে ভাবলে—এত বড় ব্যবসাদার, ক'লকাতায় যার জুড়ী মেলে না—আজ তারও বুদ্ধি-ভ্রংশ!...মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।

মেনকা আদুরে মেয়ে হ'লেও বাপের ডান হাত। অনেক কাজই সে শিখে নিয়েছে। ম্যানেজার বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—সকাল বেলায় যে থিয়েটার-করা বাবুটি এসেছিলেন, কি তার নাম?

—প্রকাশ বাবু।

—চেক্‌খানা নিয়ে গেছে?

—না, ছুটোর সময় আস্‌বে নিতে।

মেনকা গম্ভীর হ'য়ে খানিকক্ষণ ভাব্‌লে, তারপর বল্‌লে—সেখানা নিয়ে আসুন তো, একবার আমি দেখ্‌বো।

ম্যানেজার চেক্ আন্‌লে, মেনকা সেখানা দুহাত দিয়ে কুটি কুটি করে

ছিঁড়ে, আগের মত গম্ভীর মুখেই ব'ললে—কিন্তু মনে রাখ্বেন—বাবাকে যেন না বলা হয়, আর সেই প্রকাশ বাবুটিকে যেন কোনো দিন বাড়ী ঢুক্‌তে না দেওয়া হয়।

ম্যানেজার তো অবাক্!

মেনকা ব'ললে—পেটে অন্ন নেই, পরণে এক টুক্‌রো ছেঁড়া ন্যাকড়া জোটে না, চালে খড় উড়ে গেছে—এইতো দেশের লোকের অবস্থা,...... থিয়েটারের নতুন বাড়ী কর্‌তে দেড় লাখ টাকা দান!...আপনি কি বলেন? ভগবান রাগ করবেন না?...সেই প্রকাশ বাবুকে ব'লে দেবেন—অন্য রকম কিছু ব্যবসা করতে চাইলে হাজার কতক আমরা দিয়ে দেব।......এইতো আজকের কাগজেই বেরিয়েচে—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়ো, দিনাজপুর জেলার অনেক লোকে তেঁতুল-পাতা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ম্যানেজার মাথা হেঁট ক'রে ব'ল্‌লে—আচ্ছা, প্রকাশ বাবু এলে ব'ল্‌বো।

—হ্যাঁ, আর অন্য ব্যবসা করতে যদি রাজী না হয়, তা হ'লে বলে দেবেন—আমাদের বাড়ী আসা তার একদম বন্ধ করা হ'ল।...

ম্যানেজার আপন বাড়ীতে নাওয়া-খাওয়ার জন্য চলে গেল।

মেনকা তার শূন্য ঘরখানার মেজেয় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—কুবেরের মত এই ঐশ্বর্য্যের মাথায় দাঁড়িয়ে, সে তার বাবাকে ভগবানের চরণে অপরাধ কর্‌তে কিছুতেই দেবে না। তার যে মার পেটের ভাই নেই—এ অভাব সে নিজেই ঘুচিয়ে নেবে। কিন্তু একটা যদি দোসর থাক্‌তো! ...মন্ত্রণার ভাণ্ডার তার অফুরন্ত, কিন্তু কাজে লাগাবার সৎক্ষেত্র অথবা বিলিয়ে দেওয়ার সৎপাত্র নেই!......

ছুটোর অনেকখানি পরে ম্যানেজার জানিয়ে গেল—প্রকাশ বাবু অন্য ব্যবসা করতে রাজী হ'য়েচেন। টাকা নিতে কাল আস্‌বেন।

মেনকা বল্‌লে—ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা তাঁকে বলা হয়নি,—ক'ল্‌কাতা থেকে অনেকখানি দূর অঞ্চলে গিয়ে ব্যবসা করতে যদি রাজী থাকেন, তবেই টাকা দেব, নইলে নয়। এখানে থাক্‌লে আবার স্কন্ধে চাপ্‌বেন। ওসব থিয়েটারী স্বভাব কি না...বইতে ঢের পড়্‌লাম। কাল এলে সর্ত্তটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।...ঐ সঙ্গে আরও একটু ব'লে রাখবেন—বাবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কিছুদিনের মত বন্ধ রাখ্‌তে হবে।......

বেরুতেও যেমন দেরী হ'য়েছিল—ফির্‌তেও তেমনি দেরী হ'ল—রাত্রি দশটার সময় ভবতোষ বাড়ী এলো।

আহার শেষ হ'য়ে গেলে, মেনকা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা প্রকাশ বাবুর সঙ্গে কি তোমার আগে থেকে আলাপ ছিল, বাবা?

ভবতোষ ঈষৎ হেসে জবাব দিলে—শুধু আলাপ নয় মা, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।...দেশের মায়া ত্যাগ ক'রে দুজনেই একসঙ্গে ক'লকাতায় চ'লে এলাম—সে আজ কত বছরের কথা!

মেনকা অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলে। জিজ্ঞাসা করলে—দুজনেই বুঝি যুক্তি করে পালিয়ে এলে? কিন্তু আসার কারণ?

ভবতোষ তখন খাটের ওপর শুয়ে প'ড়েচে। মেনকা তার পাশটিতে ব'সে। বাপকে অন্যমনস্ক বুঝে, সেও কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলো। তারপর গলা ঝেড়ে পুনঃ প্রশ্ন করলে—পালিয়ে এসেছিলে কেন বাবা?

ভবতোষ প্রবল বিরক্তির সঙ্গে মুখখানা কুঞ্চিত করলে। তারপর একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই, যথেষ্ট সংক্ষেপে জবাব দিলে—পাড়াগাঁয়ের

লোকগুলো পাজীর পা-ঝাড়া!...বাবা মারা যেতেই ছেলেমানুষ পেয়ে আমাকে নানা রকমে ঠকাতে স্থরু ক'রেছিল।

মেনকা ব'ললে—তুমি সাধ-সাধ ক'রে ঠ'কে ছিলে বাবা! নইলে পাড়াগাঁয়ের লোকের সাধ্য কি যে, তোমার বুদ্ধির নাগাল্ পায়।

বাপের বিরক্তি-ভাবটুকু মেয়ের তরফ্ থেকে গুণ-কীর্ত্তন শুনে দস্তুর মত কম হ'য়ে এল।

খানিকক্ষণ নীরব হ'য়ে সম্ভবতঃ স্বদেশবাসীর সেকেলে আচার-অত্যাচারের সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল।

মেনকা জিজ্ঞাসা করলে—আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে বাবা!...... ক'লকাতার একঘেয়েমীর মমতা কাটিয়ে, দিন কতক দেশের আব্হাওয়াটা বুঝে এলে দোষ কি?...আচ্ছা, সেখানে আমাদের বাড়ী-ঘর কিছু আছে?

ভবতোষ অন্যমনস্কের মত জবাব দিলে—ছিল তো।...কিন্তু সে পঁচিশ বছর আগে।

মেনকা ব'ললে—বাড়ী না থাক্‌তে পারে, কিন্তু জায়গাটুকু তো নষ্ট হয়নি বাবা?...কাল সকালে আমি ম্যানেজার বাবুকে ব'লে দিচ্ছি,...... মাস দুয়েকের ভেতর মাঝারী রকমের একখানা বাড়ী নিশ্চয়ই তৈরী হ'য়ে যাবে।...আচ্ছা প্রকাশ বাবু আর কখনো দেশে যান্‌নি?

ভবতোষ ব'ললে—কি জানি, বোধ হয় যায়নি। ও তো থিয়েটার-থিয়েটার ক'রেই জীবন কাটিয়ে দিলে।

মেনকা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, এক দেশেই বাড়ী, একই দিনে যুক্তি করে' দেশত্যাগী হ'য়েছিলে,—অথচ তাঁর ভেতরের কথা কিচ্ছু জানো না?...আবার এক কথাতেই তাঁকে রাশ রাশ টাকা—

ভবতোষ ব'লে উঠ্‌লো—টাকাকড়ির দরকার হলেই সে আসে কিনা,

অন্য সময় আর খোঁজ রাখে না। তা ছাড়া ঐ যে তার ব্যবসা...পয়সার ছিনিমিনি খেলা......আস্‌চেও যত, যাচ্ছেও তত ; আমারও সময় কম—কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই বলিনি ...

ঘড়ির বাজ্‌নায় বাপ-মেয়ে দুজনকারই খেয়াল হ'ল—রাত্রি বারোটা। ...নিজের ঘরে উঠে যেতে যেতে মেনকা বল্‌লে—আমি কিন্তু দিন কতক দেশে না গিয়ে ছাড়্‌চি না বাবা !

ভবতোষ মাথা নাড়্‌তে-নাড়্‌তে জবাব দিলে—ম্যালেরিয়ার ডিপো, কলেরার গ্রীষ্মাবাস, বসন্তের পুণ্যতীর্থ, কালাজ্বরের শ্রীক্ষেত্র, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার শ্বশুরবাড়ী, আর মন-কষাকষি, পেজোমি, জাল-জোচ্চুরি, দলাদলি, খুন-জখম ইত্যাদির একচেটে ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে, সেখানে তোর আমার ঠাঁই নেই মিনু !

মেনকা বিস্মিত হ'ল না।—এমন ধারা অবস্থার কথা সে তো খবরের কাগজে কি দিনই জান্‌তে পারছে। ব'ললে—তবু তো সেখানে মানুষ আছে বাবা !—যারা সেখানকার বারোমেসে অধিবাসী, তারাও তো মানুষ—তাদেরও ত প্রাণ আছে !

ভবতোষ অবজ্ঞার হাসি হেসে ব'ললে—হুঁ্যা মানুষ বটে, তবে মনুষ্যত্ব-হীন—নিস্প্রাণ ! আঁধারটাই তাদের গা-সহা, আলোর জৌলুস তাদের চোখে লাগে।...যত সব হিংসুটের দল !

মেনকা ভাবতে লাগ্‌লো।

ভবতোষের তখন নাকডাকা সুরু হ'য়ে গেছে।...কোন ভাবনাই তার মনে আসে না। পল্লীর লোক কিন্তু অধঃপতিত পল্লীবাসীর দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন !

মেনকা ভাবতে ভাবতে আপন ঘরে চ'লে গেল—এ অন্যায়—অন্যায় !

ভগবানের কাছে অপরাধী হওয়া! ভাই আগুণে ঝাঁপ দিচ্ছে, জলে ডুব দিতে যাচ্ছে—অথচ ভাই হ’য়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে তা চোখে দেখা!—এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ!...সারারাত তার চোখে ঘুম এলো না।...

সকাল হ’ল।...বাপের সঙ্গে মেয়ের বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হ’ল না। ভবতোষ রোজ্‌কার মতই তার কাজে বেরিয়ে গেল।...

মেনকার নিজের কিছু টাকা ছিল। ব্যাঙ্কে জমা থাকৃতো, দরকারের সময় উঠিয়ে নিত।...চেক্ বইখানা খুলে দেখ্‌লে—পঞ্চান্ন হাজার টাকার মধ্যে আর হাজার ছয়েক মাত্র অবশিষ্ট। পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষে সাহায্য করে, অনাথ-আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, নারী-শিল্প সমিতি, বালিকা-বিদ্যালয়, আইন-অমান্য শিবির ইত্যাদিতে দান ক’রে ক’রে সব ফুরিয়ে ফেলেচে। ভবতোষ নাম কিন্‌তে সামান্য সামান্য দান করতো বটে, কিন্তু তা বিশেষ সৎকার্য্যে নয়।...প্রকাশ বাবুর দরুণ দেড়লাখ টাকার চেক্‌খানা ছিঁড়ে ফেলে মেনকার অনুতাপ হ’ল। টাকাটা নিজে আনিয়ে, দেশে ঘরবাড়ী কর্‌লেই যেন সব দিক্ মানিয়ে যেত।...

রাত্রিতে ভবতোষ আহারে ব’সলে মেনকা আব্‌দারের সুরে ব’ললে —আমার কিছু টাকা চাই বাবা! একখানা চেক্ দিতে হবে।

ভবতোষ বিস্মিত হ’য়ে চাইতেই, মেনকা ব’ললে—বেশী চাইনা, লাখ্ দুই।

লুচির আধ খানা হাতের ফাঁকেই র’য়ে গেল,—ভবতোষ দারুণ বিস্ময় নিয়ে কন্যার দিকে চাইলে।

মেনকা ব’ললে—থিয়েটারে বাজে খরচ করতে দিতে পারো, আর আমার বেলাতেই যত গোল তোমার। ও সব শুন্‌বো না আমি। খেয়ে উঠে চেক্ লিখে দাও।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে—তোর অত টাকা সব হ'ল কি?

মেনকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে—সে আমি ভাঙ্‌বো না। ...তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশে বাড়ী করবো।

ভবতোষ ব'ললে—পাগ্‌লামি করিসনি মেনকা! দেশ কোথা যে সেখানে বাড়ী করবি? রাক্ষসের পুরীতে কি মানুষ যায়?...এই তো পরশুদিন লেখাপড়া হ'য়ে যাবে,—বিধু মিত্তির তার তিন বছরের ছেলেটাকে পুষ্যিপুত্তুর দিতে রাজী হ'য়েছে। একটা যক্তি ক'রে, হাজার কতক টাকা দিয়ে দিলেই হবে।...যা কিছু আছে, সব তো তোরই, পুষ্যিপুত্তুর সেও তুই-ই নিবি।...ভবিষ্যতটাকে পায়ে ঠেল্‌লে, কাঁদবার জন্যে আমি বেঁচে থাক্‌বো না, মা!

মেনকা উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—পরের ছেলেকে অমনভাবে আপনার করতে আমি চাইনে।...নিজের নেই, থাক্‌লে তার ভাবনা তুমি আমি দুজনেই ভাব্‌তাম। একটা ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে আর দশটাকে কাঙাল করবার মহাপাপ আমি কিছুতে ঘাড় পেতে নেব না।

আহার শেষ হ'য়ে গেছে, আচ্‌মনের জন্য উঠ্‌তে উঠ্‌তে ভবতোষ ব'ললে—বেশ তো ছিলি মিনু,—এসব খাম্‌-খেয়ালী ভাব কোথেকে আন্‌লি বল্‌ তো?...দিব্যি কচি ছেলে 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, তাকে খাওয়াবি-পরাবি, কত সাধ-আহ্লাদ করবি—

মেনকা কাঁদ কাঁদ হয়ে ব'ল্‌লে—আমি তা পারবো না—পারবো না। একটা ছেলের 'মা' বলা শুনে আমার তৃপ্তি হবে না বাবা!...তা ছাড়া টাকা দিয়ে ঐ মার বুকের ধনটিকে কেড়ে নেওয়া...না না, আমি চাইনে।

ভবতোষ ভাব্‌তে ভাব্‌তে খাটের উপর ব'সলো।

মেনকা পান-তামাকের ব্যবস্থা করে' দিয়ে, আলমারী থেকে বাপের চেক্ বই-খানা বের ক'রে ফেল্‌লে।

ভবতোষ বাইরে বাইরে যত রাগই করুক্, মেনকার রাগকে সে সব-চেয়ে বেশী সমীহ ক'রে চ'ল্‌তো,...স্নেহের দুর্ব্বলতা!...বল্‌লে—যা করিস ক'লকাতায় থেকে কর্ মিনু, দেশে যাওয়ার নামও মুখে আনিস্‌নে।...... সে কি বাস করবার জায়গা, তাই একরাশ টাকা নষ্ট করে' জংলা বাঘ-ভালুকের বাসার কাছে বাড়ী তৈরী কর্‌বি?...তারা সব বেজায় ছোট-লোক মা! এক একটা রাক্ষস—গাঁটকাটা—খুনে—জালিয়াৎ!

তেজোদৃপ্তকণ্ঠে মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—কিন্তু তার জন্যে তোমরাই দায়ী! তোমরা কেন দেশের লোক হ'য়ে দেশের পানে চাইলে না? তোমরা কেন সহরের চাক্‌চিক্যে ভুলে জন্মভূমির দুঃখ বুঝ্‌লে না?—কেন হাতে-পায়ে-বুকে শক্তি থাক্‌তে দুর্ব্বলকে এম্‌নি করে সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় ঠেলে দিলে?

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আপন মনে বল্‌লে—কিন্তু আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।...

বছর পঁচিশ আগে ষোল আনা মাপের পাকা তিন বিঘে বাস্তুর উপর ভবতোষের পৈতৃক বসত বাড়ী ছিল।...মেনকার কাছ থেকে যথারীতি উপদেশ নিয়ে তাদের ম্যানেজার শীতল বাবু যখন গ্রামে এসে পৌঁছ্‌লো, তখন সবে সন্ধ্যা।

গ্রামের নাম ভরতপুর, ভাগীরথির কোলের কাছে, আর দ্বারকা নদীর পিঠের কাছে—মুর্শিদাবাদ জেলায়।

একে রাত্রিকাল, তায় অপরিচিত ব'লে, অতি প্রাচীন যুগের ধারা অনুসারে, ম্যানেজার শীতল বাবু, পল্লীগ্রামের অধিবাসীর তরফ্‌ থেকে কিছুমাত্র সহানুভূতি পেলে না; অতিথি হ'য়ে জমিদার বাবুদের ঘোড়া-গরু-থাকা আস্তাবলেও তার রাতটুকু মাথা গুঁজে থাক্‌বার ঠাঁই মিল্‌লো না। নিরুপায় হ'য়ে একটা অতিক্ষুদ্র দরমার বেড়া-দেওয়া ময়রার দোকানে আট আনা ভাড়া দিয়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ক'রে নিলে।......ময়রার কাছ থেকে কথায় কথায় মেনকাদের বসতবাড়ীর মোটামুটি ইতিহাসও সে জান্‌তে পেরেছিল।...

...সকাল বেলায় উঠে, শীতলবাবু সরাসরি জমিদার বাবুর কাছারীতে গিয়ে, বেশ কায়েমি হ'য়ে আসন পরিগ্রহ ক'রে বল্‌লে—আমি ক'লকাতার শ্রীযুত ভবতোষ বোসের কর্ম্মচারী।...আপনার কাছে এসেচি।

জমিদার বাবু প্রবীণ লোক, প্রায় ঐ ভবতোষদেরই বয়সী এবং স্বজাতিও অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে তিনি বল্‌লেন—আমার কাছে এসেচেন—কিন্তু কি প্রয়োজন?

শীতলরাম ব'ললে—ক'লকাতা থেকে যখন রওনা হই, তখন অবশ্য জানতাম না যে, আপনার কাছেই আস্‌তে হবে। সেটা বুঝ্‌লাম—এই ভরতপুরের মাটীতে পা দেওয়ার ঘণ্টাকতক পরে।

জমিদার বাবু ব'ললেন—ও, তা হ'লে উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করুন।... হ্যাঁ, আপনি কার কর্ম্মচারী বল্‌লেন?

—শ্রীযুত ভবতোষ বোস মশায়ের......ক'লকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার।

জমিদার বাবু বেশ কুটীল রকমের একটু হাসি হাস্‌লেন, তারপর হাসি-হাসি মুখেই ব'ল্‌লেন—ক'লকাতার ব্যবসাদার ধনী—সে ক'লকাতাতেই শুনতে ভাল। আমাদের পল্লীগ্রামে ওসবের কদর নেই মশায়!...তা সে ধনী ব্যবসাদার বাবুর কি আবশ্যক এখানে?

শীতলও ঠিক পাকা চালেই চ'ল্‌তে সুরু করলে। জবাব দিলে—ঐ যে মশায়ের একটা গরুবেচা হাট আছে না? ঐ জায়গাটুকুর দখল চাই। মশায় পাকা জমিদার, অনেক কাজে মাথা ঘামাতে হয়, সম্ভবতঃ ভুলে গেছেন—ওটা আমার মনিবের নিষ্কর বসতবাড়ী ছিল। আর আপনাকে ভুলে যাওয়ার দরুণ কিছুমাত্র দোষ দেওয়া চলে না,—আজকের কথা তো নয়!...তারপর অল্প একটু হেসে ব'ললে—বারো বছরে আমরা একটা যুগ ধরি। আজ পঁচিশেরও হয়তো বেশী হয়ে গেছে...দু দুটো যুগ! মনে রাখাই যে অসম্ভব!

জমিদার বাবু গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন।

শীতল ব'লতে লাগলো—এর জন্যে আমরা একটুও ত্রুটী ধর্‌বো না। এমন কি আপনার হাট-বাজারের জিনিসপত্র মায় গরু-বাছুর পর্য্যন্ত নিজেদের খরচায় সরিয়ে দেব।

জমিদার বাবু খুব জোরে হেসে উঠ্‌লেন।...শীতল একটুখানি ভড়্‌কে গেল।

জমিদার বাবু কাছারিঘরে সমবেত ভদ্র-অভদ্রদের লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—শোনো হে, তোমরা গল্প শোনো! আমাদের গৌর খুড়োকে একবার ডেকে পাঠাও,—আষাঢ়ে গল্প গোটাকতক এঁর কাছ থেকে শিখে রাখ্‌বে। কাহিনী বলার যে ঝোঁক্ তার!...বলি মশায়! আপনাদের আসল মতলবটা কি এই?—বাড়ী ব'য়ে মেরে পালানো?... ভবতোষ বোস ব'লে কোন লোককে আমরা চিনিনে—জানিনে।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজে খচ্ খচ্ ক'রে লাইন কতক লিখে, পাইক্‌কে আদেশ করলেন—যা তো রে— এটা নিয়ে,...বংশী ঠাকুর, রমাই পণ্ডিত, শ্যাম্ ভট্‌চায্ এদের সকলকে দেখিয়ে আয়! ...হাতে-হাতে প্রমাণ দিয়ে দিই।...

পাইক্ চ'লে গেল।

শীতল ব'ল্‌লে—আপনার দেওয়া প্রমাণ যদি যথেষ্ট ব'লে আমরা না মান্‌তে পারি, তা হ'লে অপরাধ নেবেন না।...আসল কথা—আজকেই জায়গাটার দখল দিতে হ'বে। আমাদের দেরী করা চ'ল্‌বে না।...

জমিদারের চিঠি পাঠ মাত্রই, সেকেলে ষাট-সত্তর পঁচাত্তরের প্রবীণ কর্ত্তারা হাজির হ'লেন।

জমিদার বাবু বল্‌লেন—শোনো হে, একটা গাঁজা-খুরি গল্প শোনো...ভবতোষ ঘোষ ব'লে কে একজন—

শীতল ব'লে উঠ্‌লো—আজ্ঞে ঘোষ নন্—ভবতোষ বোস্।

—আচ্ছা আচ্ছা বোসই,...তাকে তোমরা কেউ জানো? পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে ভরতপুরে কেউ এই নামের লোক ছিল?

প্রবীণরা মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে জবাব দিলেন—নামটাই তো আজ নতুন শুনচি!

জমিদার বাবুর সে কী বিকট হাসি!...এক কোণে সত্তর বছরের বৃদ্ধ রমাই পণ্ডিতকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—কি পণ্ডিত! জানো?

রমাই পণ্ডিত ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন—জানি বৈকি! মনতোষ বোসের ছেলে ভবতোষ বোস,—যেখানে গরুর হাট ব'সেচে—ঐখানে তাদের বাড়ী ছিল।...মনতোষ বোস মারা গেলে তার ওই নাবালক ছেলেটাকে—

রমাই পণ্ডিতের কথা শেষ না হ'তেই শীতলরাম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে—নমস্কার! তা হ'লে উঠ্‌লাম আজকের মত...অপরাধ নেবেন না বাবু!...ছোট মুখে বড় কথা...আপনার মান্য বজায় রাখ্‌তে পারিনি।...

তার পর রমাই পণ্ডিতের ছু'পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত আপন মাথায় ঠেকাতেই পণ্ডিত চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—হাঁ হাঁ...আমি বামুন নই বামুন নই—

শীতল হাতযোড় ক'রে দৃপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে—আপনিই বামুনের সেরা বামুন!......কাল আপনার নামটা যদি জান্‌তে পারতাম, তা হ'লে বিদেশে এসে রাত কাটাবার দুর্ভাবনায় অস্থির হ'তে হ'ত না।—ব'লে আর একবার নমস্কার জানিয়েই সটান্ রাস্তায় নেমে পড়লো।

এতক্ষণে জমিদার বাবু অসাধারণ ও উদ্ধত গাম্ভীর্য্য নিয়ে পণ্ডিতের পানে চাইলেন। রমাই তা দেখ্‌লেন, কিন্তু তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল—যেন গ্রাহ্য কর্‌লেন না।

জমীদার বাবু তীব্র স্বরে বল্‌লেন—বলি, খুব তো সাঁতার শিখেচ দেখ্‌ছি হে পণ্ডিতজি! পারবে তো?

পণ্ডিতজি মুখ তুলে চাইতেই, জমিদার বাবু বল্‌লেন—জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম—জলে বাস করে' কুমীরের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস হবে তো? ...তার পর বংশী ঠাকুর ও শ্যাম ভট্‌চায্‌কে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—এত বড় ছোট লোক হাড়্‌পাকা বেইমান্ তোমরা কেউ দেখেছ?...পাছে গোলমাল্ ক'রে বসে—সেই ভয়ে অমন পষ্টাপষ্টি লিখে পর্য্যন্ত পাঠালাম। ...একটিবার ভাবলে না যে, তোর পঁচিশ-বছরের পালিয়ে-যাওয়া ভবতোষের সাত গুষ্টির সাধ্যি নাই—আমি যদি রুখে উঠি তা রোধ ক'রে দাঁড়ায়!...গাঁয়ে বাস ক'রে উঠ্‌তে বস্‌তে যার সাহায্য নিতে হয়, তাকে কোথাকার এক বিদিশী লোকের সুমুখে জুতোপট্টি করা!...আচ্ছা বাবা রমাই পণ্ডিত!—জিতা রহো!

শ্যাম ভট্‌চায্ ব'ললেন—পণ্ডিতের এটা ভাল কাজ হ'ল না হে, কথায় বলে—স্বদেশের শত্রু ভাল, তবু বিদিশী বন্ধু ভাল না!...ভবতোষ এখন কে আমাদের?...আর এঁর সঙ্গে বিবাদ...

রমাই পণ্ডিত ধীর স্বরে ব'ললেন—বিবাদ কাকে বলে আমি আজও জানি না, ভট্‌চায্!...এই ভরতপুরে আমাদের তিনপুরুষের বাস, গুরু-মশাইগিরি ক'রে তিন কাল গিয়েচে।...'মিথ্যা বলা বড় দোষ'—ব'লে যা সমস্ত ভরতপুরের বহু বহু ছাত্র-ছাত্রীর কাণে এতকাল ক'য়ে এসেচি, আজ কি সেই কথাটা আমাকেই ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে ব'লতে বলো তোমরা?...

...সেই দিন রাত দুপুরে যখন সামান্য সামান্য ঝড় উঠেছিল, তখন গ্রাম্য চৌকিদার রোঁদে বেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলে—পশ্চিমপাড়াটা আলোতে ধুয়ে গেছে!

রমাই পণ্ডিতের বড় ঘরখানা তখন হু হু ক’রে জ্বলে যাচ্ছে!...

ছ মাস পরের কথা।

প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী তৈরী হ’য়েচে। আজ বিকেলের গাড়ীতে মেনকার এখানে আস্‌বার কথা।...বাড়ীতে কেউ ছিল না—কেবল দুই-জন হিন্দুস্থানী দারোয়ান্।

জায়গা দখলের সামান্য একটু ইতিহাস এইখানে ব’লে রাখি—

শীতল সেই ঘটনার পর হপ্তাখানেকের মধ্যে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিয়ে ভরতপুরে এসে দেখলে—গরুর হাটের চিহ্ন মাত্র নাই, প’ড়ো জায়গার যে অবস্থা হয়, ভবতোষের বসতবাড়ীর ঠাঁইটুকুও সেই অবস্থায় র’য়েচে!... ম্যাজিষ্ট্রেট জমিদার বাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে, তিনি জবাব দিলেন —দেশের একটা সাধারণ কাজে কিছু দিনের জন্য জায়গাটুকু নেওয়া হয়েছিল, যেদিন শুন্‌লাম—এতদিন পরে আমাদের ভবতোষ বাবু দেশে ফিরে আসচেন্, সেই দিনই সব সাফ্ ক’রে রেখেচি।......

ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরে গেলেন। শীতল মনে মনে ভাব্‌লে—আত্মরক্ষার পক্ষে মাথাটা মন্দ খেলায় নি...হাঁ পলিসি বটে!......

* * * ট্রেণ থেকে নেমে মেনকা দেখ্‌লে—তাদের দুজন দারোয়ান আর একখানা পাল্কী,—বেহারা সমেত ষ্টেশনে হাজির আছে। সঙ্গে শীতল এসেছিল। ভবতোষ কাজের ভিড়ে আসতে পারে নি। দিন চার পরে আস্‌বে।

পাল্কীতে উঠ্‌তে যাবে,—একটি বাবু চীৎকার ক’রে ব’ললে—এই পাজী ছোটলোক ব্যাটারা! এখনো তোদের মদ খাওয়া শেষ হ’ল না! শীগ্‌গীর আয়! পাল্কী ওঠা!...

নিতান্ত সাধু ভাষা—বেহারাদের উদ্দেশে! বক্তা—জমিদার বাবুর পুত্র শান্তিরাম।...মেনকা ফিরে তাকাতেই, শান্তিরামও চাইলে, তার পর শীতলকে নমস্কার জানিয়ে বল্‌লে—ভাল তো ম্যানেজার বাবু?... আমি ঘণ্টাখানেক ধ'রে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। বাবা ব'ললেন—তুই নিজে ষ্টেশনে যা!...মেয়েদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়।...

শীতল জমিদার-পরিবারের এই সহৃদয় অভ্যর্থনার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অল্প অল্প হাস্‌তে লাগ্‌লো।...

পাল্কী চল্‌তে সুরু ক'রেছে।—শান্তিরাম হেঁকে' ব'ললে—সোজা আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবি।···নতুন বাড়ী তো এখনো তেমন সারা হয়নি। বাবা ঐ জন্যেই আরো আমাকে পাঠালেন।...

কিন্তু ভিতর থেকে মেনকা হুকুম কর্‌লে—সোজা রমাই পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী!

শীতল মনে ভাবলে—'আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবি!' এ আবার কি নতুনতর শয়তানী মতলব!...

শান্তিরাম নীরবে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছিল।

———

আজকাল বাহিরে বাহিরে মেনকার সঙ্গে জমীদার তরফের বিলক্ষণ ভাব; কিন্তু রমাই পণ্ডিতের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ! মেনকাকে রমাই খুব ভালবাসে, আবার মেনকাও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখায়—অপরাধ এই।

বাড়ীখানার পেছন দিকটায় তখনো কিছু কিছু রাজমিস্ত্রীদের কাজ বাকী ছিল ব'লে ইট, চূণ, বালি পর্য্যাপ্ত মজুত! হঠাৎ একদিন রাত্রি বেলায় আধা-আধি চুরি হ'য়ে গেল। আর তার পরের দিন সকাল থেকেই জমিদার বাবুদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার সুরু হ'ল।

চুরির কথা শুনেই শান্তিরাম তদারকে এলো—মুখে খুব লম্ফ-ঝম্ফ দেখালে; তারপর মেনকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌লে—হারামজাদারা খেতে পাস্‌নে সে কথা জানালেই তো তার ব্যবস্থা করি, এমন ধারা না ব'লে জিনিস-পত্র সরানো! আচ্ছা, দেখি কোন্ ব্যাটা বজ্জাতের কাণ্ড! ...আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে ডাকাতি!...

শীতল ক'লকাতায় গেছে।

রমাই পণ্ডিত মেনকার অভিভাবক। কিন্তু গায়ে-পড়া হ'য়ে ভদ্রলোকদের মেয়েরা সবাই তার সঙ্গে আলাপ করতে আর খোসামুদি করতে আসে।

জমিদার বাবুর এবং তাঁর ছেলে শান্তিরামের খোঁজ-তলাসের অবধি নাই। দিনে দুপুরে, সন্ধ্যায় সকালে, যখন তখন, শান্তিরাম গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে, হাতে সোণার রিষ্ট-ওয়াচ্ এঁটে আর বুক পকেটে

ফাউণ্টেন পেন গুঁজে মেনকার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে।...রাজ-মিস্ত্রীরা কি করে-না-করে, নতুন যে স্নানের ঘাটটা তৈরী হচ্ছে—সেটার কত দূর কি হ'ল, বড় রাস্তাটায় পাথর দেওয়া হচ্ছে—তার কৎটা বাকী—এই সব কত কি !...মেনকার সঙ্গে তার মুখোমুখী কোন কথা হয় না। জবাব দেয় ভোজপুরী দারোয়ান্।...

...পশ্চিম পাড়ায় কলেরা আর দক্ষিণ পাড়ায় বসন্ত খুব জোর চলেছে। এবার ম্যালেরিয়ার ততটা জোর নেই।...মেনকা রমাই পণ্ডিতকে বল্লে—পণ্ডিত দাদা, একটা দাতব্য ডাক্তারখানা খুল্লে কেমন হয় ?...গরীবরা খালি ভুগে ভুগেই মরে, ওষুধ পায় না তো ?

রমাই গম্ভীর মুখে ব'ল্লেন—তাহলে' ভগবান দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করেন, গরীবরাও অসুখ বাড়্তে বাড়্তে সৎকারের যোগাড় দেখে না।...কিন্তু শত্রুর সংখ্যা যে প্রবল হয়ে ওঠে, দিদি !...বাবুদের বাড়ীর কমলবাবুর নাম শুনেছ ?—শান্তিরামের দূর সম্পর্কের কি রকম ভাই হয়। সে এখানে ডাক্তারী করে,—ভরতপুর আর বারচাকলায় সমস্ত গাঁয়ে তার একচেটে পসার।...সরকারী ডাক্তারখানা খুল্লেই, রাত্তিরে দুবার করে' ওষুধের ঘরে ডাকাত পড়বে নিশ্চয়।...তা ছাড়া গোড়াতেই বিঘ্ন ঘটবে,—যেমন ঘর তৈরীর সময় ; আর মাইনে-করা ডাক্তার যিনি আসবেন, কোন্ দূর অঞ্চলে রুগী দেখ্তে গিয়ে, হয় তো রুগীর বাড়ীতেই তাঁর মাথাটা চৌচির হ'য়ে থাক্বে।...এখানে ওসব চ'লবে না দিদি ! এরা সব উন্নতি চায় না,—চায় ধ্বংস।

মেনকার চট্ ক'রে মনে পড়ে গেল—তার বাপের কথা !—অবিকল মিলে যাচ্ছে !...কিন্তু সে হ'টে যাবার জন্যে তো আসেনি, সে অপমান তিরস্কারকে বুক পেতে নিয়ে উপকার পুরস্কার দেবে। অনেক ভেবে

চিন্তে ক'লকাতায় চিঠি লিখ্লে—একজন বড় বিল্ডিং-কণ্ট্রাক্টরকে যেন পাঠানো হয়।

গাঁয়ে দুটো দল হ'ল। একদল জমীদার-পক্ষে, অন্যদল রমাইকে নিয়ে মেনকার পক্ষে। কিন্তু তবু তারা জমীদারদের সাম্না-সাম্নি বিদ্রোহ কর্তে পারে না। আবার এই দুই দলের মধ্যেও ছোট টুক্রো উপদল অনেক আছে। এর কথা ওকে লাগানো, ওর জিনিস না বলে' নিয়ে যাওয়া, জোর-জবরদস্তিতে মারধোর করা—এও অনেকে করে।

মেনকা দেখ্লে—খালি ভরতপুর নয়, সব গাঁয়েরই এক অবস্থা।... অথচ এবারকার মত দুর্বৎসর অনেক কাল আসেনি।

অনাবৃষ্টির দরুণ চারদিকে ভয়ানক অন্নকষ্ট হওয়াতে মধ্যবিত্ত ও গরীবদের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। মেনকা ইচ্ছা করেই চারিদিকে রাস্তা-ঘাট, ডাক্তারখানা, ইস্কুল, ইন্দারা তৈরী ইত্যাদি অনেক রকমের কাজ সুরু ক'রে দিলে, যাতে দেশের লোক খেটে খাওয়ার কাজ পায়। কিন্তু একটাকার দশআনা চুরি যায়, ছ আনার কাজ হয়। বাড়ী-ব'সে-থাকা অকর্ম্মা ভদ্রলোকের দল দশ-পনের টাকা মাইনেতে মেনকার অনেক কাজে নিযুক্ত হ'য়েছিল—এসব চুরি তারাই করে ও করায়। মেনকা বোঝে সব, কিন্তু কাকেও ডিস্‌মিস্ করে না—বরং ষোল আনা কাজের বোঝা তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়।

শান্তিরাম একদিন অনাহূত হ'য়ে এসে বল্লে—সব শালা চোর ডাকাত হচ্ছে।—সমস্ত কাজের আমি তদারক কর্তে চাই। হপ্তায় হপ্তায় আমার কাছে হিসেব পাবেন।...কিন্তু ঐ অত বড় ডাক্তারখানা এখানে চল্বে না; ও বাড়ীখানা মিছিমিছি তৈরী হচ্ছে।

মেনকা আড়ালে ব'সে ব'ললে—না চলে প'ড়ে থাক্‌বে ; এতো আর ব্যবসা নয় যে লোক্‌সান হবে।...

তারপর সমস্ত চোরদের সর্দ্দারী কর্‌বার ভার সে শান্তিরামকেই দিয়ে দিলে।

পশ্চিম পাড়ায় কলেরার আক্রমণ পূরো মাত্রায় চল্‌ছে শুনে, মেনকা রমাই পণ্ডিতকে ডেকে বল্‌লে—এখানকার ডাক্তার কি সকল রুগী দেখে না, পণ্ডিত দাদা ?—এখনো ব্যারাম কম্‌লো না যে।

রমাই ব'ললেন—ডাক্তারে কি করবে দিদি ?—কিন্তু এখন থেকে নতুন ক'রে যাদের হচ্ছে তাদের যাতে আরাম হয়, আর নতুন কারুর না হয় আমাদের সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তোমার ডাক্তার বাবুও আজ রিপোর্ট দিয়েছেন। দেশের এই দুঃসময়ে লোক্ না খেতে পেয়ে মর্‌তে ব'সেচে, আর এখানকার কতকগুলো পাজী দোকানদার মতলব এঁটেছে—এই সালেই তারা বড়লোক হবে।...আধা আধি পাথর-গুঁড়ো মেশানো পচা গমের আটা-ময়দা, আর রেঙ্গুনের চূণ মেশানো মোটা চালের ভাঙা-ভাঙা গুঁড়ো, ব্যাটারা এত সস্তায় বাইরে থেকে আমদানি কর্‌ছে যে, সম্ভব মত লাভ নিয়ে যদি বেচ্‌তো, তাহ'লে গরীবদের এত দুর্দ্দশা হ'ত না। ব্যাটারা ডবলেরও বেশী দরে বিক্রী করছে।... এখানকার লোকে তাই সস্তা ভেবে, দিন কতক খায়, তারপর যখন পয়সা জোটে না, তখন এক মুঠো ঐ ক্ষুদের সঙ্গে লতাপাতা সিদ্ধ করে, নয় ত একটু পুরোণো মাৎ গুড়ের ছিটে দিয়ে সেই বিশ্রী ময়দা জলে গুলে খায়, তারপর বদ্‌হজম হ'য়ে—

মেনকা বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ্ মুছলে।

সেই দিনই সে শীতলকে চিঠি লিখে দিলে—হাজার মন কি আরও

বেশী চাল আর শ পাঁচেক মণ আটা-ময়দা ইত্যাদি ভরতপুরে যেন অবিলম্বে পাঠানো হয়।...

দিন সাতেকের মধ্যে প্রকাণ্ড একখানা দোকান হ'ল—চাল, ডাল, আটা, ময়দা। আর কিছু না।

মেনকা রমাইকে বল্‌লে—আপনার যাকে যাকে বিশ্বাস হয়, তাকে তাকে বিক্রী করবার ভার দিন।...দেশের লোক সম্ভবমত খেটে উপযুক্ত মজুরী পাচ্ছে; সুতরাং আমাদের কেনা দাম দিয়েই কিনতে পারবে।... যারা অক্ষম, তাদের দরকার মত দান করবেন।...কিন্তু ব্যায়রাম যদি না কমে, তা হলে তো সর্ব্বনাশ।...শুন্‌ছি নাকি ম্যালেরিয়াও একটু একটু সুরু হয়েছে।...আচ্ছা এত যে পসার, কিন্তু কমলবাবুর ডাক্তার খানাটা কোথায়, তা শুন্‌লাম না তো!

রমাই পণ্ডিত বিরক্তির হাসি হেসে বল্‌লেন—ঘরের মধ্যে ঘর, বেজায় আঁধার—দিন বারোটায় হ্যারিকেন জ্বাল্‌তে হয়, সেখানে একটা ভাঙা আল্‌মারির মধ্যে গোটা কুড়ি-পঁচিশ শিশি আছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই ফুঁকো।........জেলা বোর্ড থেকে অসুখের সময় বিনা মূল্যে যে কুইনিন্ দেওয়া হয়, কমলবাবু প্রার্থীকে বঞ্চিত করে সেই কুইনিন্ পাতকুয়ার জলে গুলে রুগীদের খেতে দেয়; সম্বৎসরে ওষুধের দাম যা আদায় হয় হ'ল,—বাকীটার জন্যে নতুন খাতার চিঠি দেয়। মুদীর দোকানের বাকী-বকেয়া লোকে অনেক সময় শোধ দিতে পারে না, কিন্তু কমলবাবুর টাকার পাই-পয়সাটি দিয়ে দেয়...প্রাণের দায়!......

দোকান খোলা হ'লে একদিন ভবতোষ এলো।

মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে আনন্দও দেখালে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিতও হ'ল...মাঝ দরিয়ায় হাল না ছেঁড়ে।

মেনকা ব'ললে—হাল ছেঁড়ে ছিঁড়ুক, কিন্তু নৌকো ডুব্‌বে না বাবা! সে তুমি দেখে নিয়ো।

ভবতোষ সেইদিন ক'লকাতায় গিয়ে দশখানা কাগজে লেখা পাঠালে—পল্লীর সুসন্তান যাঁরা, সহরের চাক্‌চিক্যে ভুলে পল্লীর ব্যথা বিস্মৃত হ'য়েচেন, তাঁরা পল্লীতে ফিরে আসুন! মাতার দুর্দ্দশার দিনে সন্তানের এই ঔদাসীন্য শুধু দোষ নয়—মহাপাপ! ইত্যাদি...

ভবতোষ চ'লে যাওয়ার পরের দিন রাত্রিতে, দোকানকে-দোকান লুঠ হ'য়ে গেল। ভীষণ ডাকাতি! শান্তিরাম গাঁয়ের ক'জনকে জুটিয়ে মালপত্র লুঠ করালে; অর্থাৎ দাম দিয়ে কিন্‌বার কি দরকার—সব নিয়ে যা!...মেয়েটা যেরকম, তাতে ধরা পড়্‌লেও, কাঁদাকাটি কর্‌লেই সব মাফ হ'য়ে যাবে।

মেনকার তো চক্ষুস্থির!...সে ভেবেছিল—পল্লীসংস্কার বল্‌তে যা কিছু বোঝায়, সব সে একে একে শেষ কর্‌বে। কিন্তু সবার আগে এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের প্রাণে বাঁচানোটাই সে বেশী দরকার মনে ক'রেছিল...কিন্তু হা রে কপাল! গুটীপোকার মত এরা আপনার তৈরী জালে আপনিই বন্দী!

হাল ছিঁড়্‌লো বটে, কিন্তু মেনকার তরী ডোবেনি।

তার চেয়েও বড় ক'রে দোকান খোলা হ'ল। এবার সমস্ত রাত্রি ধরে' পাঁচ জন পুলিশ পাহারা দেয়।...

জমিদারদের পুরাতন মান খাতিরটুকু মেনকার আগমনের পর থেকে হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছিল।—এই বিলয়মান্ গৌরবকে অব্যাহত রাখবার জন্যই অনেক রকম ছলচাতুরীর আবশ্যক হচ্ছিল।

হঠাৎ দিন কতকের জ্বরে জমীদার বাবু মারা গেলেন।

এখন শান্তিরাম সর্ব্বেসর্ব্বা।

কিন্তু খাতির তাদের বাস্তবিকই অনেক ক'মে গেছে!...

দোকান লুঠ্-করা এবং আরও নানা কথা মেনকা জান্তে পারলেও, স্বর্গীয় জমিদারের শ্রাদ্ধ-দিনে সে তার বিস্তর লোক জনকে ও-বাড়ীতে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলে। তা ছাড়া ময়দা, চাল, ডাল, আটা সব সে দোকান থেকে দিয়ে দিলে। ঘি পর্য্যন্ত কিনে আনিয়ে দিলে। শান্তিরাম হাস্তে হাস্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে মাত্র। এ যেন তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হচ্ছে!...

কিন্তু মেনকা ভেবেছিল—যেমন করে হোক্ শান্তিরামকে বশ্ করতেই হবে। সে তো শত্রুর সংখ্যা বাড়াতে বা লোকের শত্রুতা করতে এখানে আসেনি, সে এসেচে—মৃত্যুপথ-যাত্রীদের ঘরে ফিরিয়ে আন্তে। ধ্বংসের উৎস-মুখে পাথর চাপা দিতে।...মেনকার পণ দৃঢ় হ'য়ে রইলো।...

জমীদার-বাড়ীতে শ্রাদ্ধের ক'দিন মেনকা সব সময়েই হাজির থাকতো। এমন কি এই ব্যাপারে শান্তিরামকে সে হাজার তিনেক টাকাও কর্জ্জ ব'লে দিয়েছিল।...

কাঙালী-বিদায়ের রাত্রিতে, মেনকা রাস্তার ধারের একখানা ঘরে, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অতুল তৃপ্তিতে শেষ দল কাঙালীদের জয়ধ্বনি-মুখর প্রত্যাগমন নীরবে দেখ্ছিল, এমন সময় শান্তিরাম প্রবেশ করল।

মেনকা ফিরে চেয়েই মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে মুখ নামিয়ে ফেললে।

শান্তিরাম একটুও ভূমিকা না ক'রে ব'ললে—মেনকা! আমাকে ভুল বুঝোনা। তোমার আমার দুজনার শক্তি যদি এক জায়গায় করি,

তা হ'লে এ চাকলার মধ্যে অভাব-অভিযোগ কারুর থাকবে না। তুমি রাজী হও—

মেনকা হেঁট হ'য়ে ব'ললে—আপনি কি আজও বোঝেন নি যে, আমি সব সময়েই রাজী?

শান্তিরাম সোৎসাহে ব'ললে—বুঝেচি ব'লেই তো বলবার সাহস রাখি,...বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো সম্ভব হ'ত না। আর সেই জন্যেই আমি এতদিন মুখ ফুটে প্রকাশ করবার সাহস পাইনি। যদি ভরসা দাও—

মেনকা ঈষৎ হেসে ব'ললে—ভরসা বরং আমাকেই দিন। যত শক্তিই থাক,—তবু আপনারা সহায় থাকলে আমি ভরতপুরকে সোণার দেশ করতে পারবো।

শান্তিরাম খুব খুসী হ'য়ে উঠলো। বললে—আগেই তো বললাম—বাবার জন্যে আমি অনেক কিছুই ক'রতে পারিনি।...তুমি কি বুঝতে পারো না মেনকা, তোমার যেদিন থেকে এই ভরতপুরে শুভাগমন হ'য়েচে, সেইদিন থেকে, আমি একান্ত ভক্তের মত সময়ে-অসময়ে বিপদে-সম্পদে সর্ব্বদা তোমার ছায়ায়-ছায়ায় ঘুরেচি? তুমি অনেক কাজে আমাকে বিশ্বাস করতে পারনি, অবশ্য এর জন্যে আমি একটুও দোষ দিচ্ছিনা—তবু আমি তোমাকে দেবীর মত ভক্তি ক'রে চলি, কারণ আমি কায়মনে বিশ্বাস করি—দীনের দুঃখ মোচন করবার শক্তি এবং ইচ্ছা যদি কারুর থাকে—তো তোমারই আছে।

মেনকা মনে মনে অনেক কথাই ভাবলে।—শান্তিরামের গূঢ় অভি-সন্ধির মধ্যে সে ধরা দিচ্ছে, না—এটা সত্যসত্যই মৌখিক স্তোক-বাক্য নয়—এইটুকু বুঝতে তার বিলম্ব হচ্ছিল।

ঘরখানা অন্ধকারে ভ'রে গেছে। লোকজনের নিবিড়তা ও কোলাহল কমে' এসেছে। রাত্রি বোধ হয় ন'টা হবে। হঠাৎ শান্তিরাম বল্লে—তোমাকে আজ প্রাণের আবেগে 'তুমি' ব'লে ফেলেছি, মেনকা! তার জন্যে এতক্ষণ মাপ চাওয়া হয়নি। কিন্তু সাধ করে' বলিনি,...মন কিছুতে মানা মানেনি।—যাকে একান্ত নিকটতম ক'রে রাখ্‌তে চাই, তাকে খাতির করে' ভদ্রতার গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রাখ্‌লে—যেন অন্তরের কাছে অনেক খানি অপরাধী হ'তে হয়। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহ'লে—

মেনকা স্মিতমুখে ব'ললে—আপত্তি? কেন—এ তো যুক্তি সঙ্গত,... আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার একটুও গরমিল নেই।

শান্তিরাম অনেক খানি কাছাকাছি হ'য়ে ব'সলো; তারপর ব'ললে —পরশুদিন আমাদের হাঁসপাতাল খুল্‌বার দিন না?—হাঁ পরশুই তো! ...আসচে মাসে আমিও দুজন রোগীর থাক্‌বার মত যা-যা দরকার দিয়ে দেব।...বাবা থাক্‌লে আর—

মেনকা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—বাবার মৃত্যুটাই বুঝি আপনি বরাবর চেয়ে আসছিলেন?...কিন্তু হাঁসপাতাল খুলবার দিনে, আপনি নিজের কাজ একটুও করতে পাবেন না। কাল থেকে আমার ওখানেই থাক্‌তে হবে। পণ্ডিত দাদা বুড়ো মানুষ,—বাবাও সন্ধ্যের গাড়ী না হ'লে আস্‌তে পারবেন না।

শান্তিরাম হঠাৎ মেনকার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে' বল্লে—আজ থেকে হুকুম করে' দেখনা!...এখনো যদি অবিশ্বাস করো, তাহ'লে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলছি মেনকা—এই জমিদারী, ঘরসংসার, ভরতপুরের মমতা সব কাটিয়ে, লোটা কম্বল নিয়ে হিমালয়ে চ'লে যাই।...

মেনকা সন্তর্পণে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর বল্‌লে—ঢের রাত হ'য়ে গেছে।...আমি এইবার বাড়ী যাবো।

অগত্যা অতৃপ্ত শান্তিরাম উঠে দাঁড়ালো।

মেনকা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।...আসবার সময় বল্‌লে—পরশু খুব সকাল সকাল যাবেন।...নমস্কার!



ভোর থেকে গ্রামের মধ্যে বেজায় ধূম প'ড়ে গেছে। ছেলে বুড়ো—কারো মুখে হাসি ছাড়া অন্য ভাব নেই।

আজ মেনকার 'ভরতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের' দ্বার উন্মোচনের দিন। কিন্তু একটা কথা ঠিক বলা হয়নি—ছেলে বুড়ো সকলের মুখে হাসি ছাড়া অন্য ভাব না থাক্‌লেও, এ চাকলার ধন্বন্তরি—সিভিল সার্জ্জনের আদর্শস্থল—মরণের হাত থেকে ফিরিয়ে আনার একটি মাত্র মালিক—আমাদের ডাক্তার কমলবাবু তাঁর শূন্য ঘরে বিনি পয়সায় পাওয়া কুইনিনের শিশিগুলো কোলে নিয়ে অবশ্য কাঁদ-কাঁদভাবেই নিরুদ্দেশ যাত্রার একটা শুভদিন ঠিক্ করছিল। আবার শান্তিরামের ওপর যে একটু আধটু রাগ হচ্ছিল না—একথাও বলা চলে না।...হায় রে, সে যদি তার মামাতো ভাইটির মুখের পানে চাইতো—ঐ ডাইনী, সধবা হ'লেও বিধবা ছুঁড়ীর প্রেমে হাবুডুবু না খেতো, তা হ'লে রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হ'য়ে, আজ এত অপমানের বোঝা ঘাড়ে ক'রে...

রমাই পণ্ডিত নিজে গ্রামের ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে সভায় যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। আজ বেলা ৫টার সময় হাঁসপাতালের দ্বার উন্মোচন করা হবে।

কমল ডাক্তারের সুমুখে এসেই তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন। মেনকার অনুরোধ জানিয়ে ব'ল্‌লেন—কমল বাবাজী, তুমি এই নতুন ডাক্তারখানায় হেড্ কম্পাউণ্ডার থাক্‌বে।

কমল মুখখানা অন্ধকার করে চেয়ে রইলো।

তার রাগ ও হচ্ছিল অত্যন্ত, দুঃখ ও হচ্ছিল যথেষ্ট।...হায়রে ভাগ্য! ...উপায় নাই কিন্তু।......

নবনির্ম্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গনে বহু লোকসমাগম হতে সুরু হ'য়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হবে পাঁচটায়; কিন্তু বেলা তিনটা না বাজ্‌তেই লোকজন জড়ো হ'তে সুরু করেছে।

শান্তিরাম প্রস্তাব ক'রেছিল—জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে নিয়ে এসে ডাক্তারখানার দ্বার উন্মোচন করা হোক্‌।—কিন্তু মেনকা তাতে মত দেয়নি। সে ব'লেছে—যোগ্য লোক আমি যাকে ঠিক ক'রেছি, তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যাকে অপনারা এত বড় সম্মান দিতে পারেন।... তারপর উচ্ছ্বসিত আবেগে যোগ্য ব্যক্তিটির নামও প্রকাশ করে ব'লেছে —'আমার পণ্ডিত দাদা...রমাই পণ্ডিত মশায়।'

শান্তিরাম ভেতরে যাই ভাবুক, বাইরে মেনকার বিবেচনা-বুদ্ধির যথেষ্ট তারিফ্‌ ক'রেছে।...

সভায় যাবার জন্য রমাই পণ্ডিত মেনকাকে তাড়া দিলেন যখন, তখন মেনকা চুপ ক'রে ব'সে ছিল।—হঠাৎ ডাক্তারখানারই একজন ভৃত্য ছুটে এসে তার হাতে এক খানা চিঠি দিয়ে জবাবের আশায় দাঁড়িয়ে রইলো।

চিঠি লিখেছিল—এই ডাক্তার খানার চার্জ নিয়ে যিনি থাকবেন, সেই নতুন এম-বি ডাক্তারবাবু।

রমাই পণ্ডিত উৎসুক হ'য়ে চাইতেই, মেনকা বল্‌লে—ডাক্তারবাবু লিখেছেন—এখনো হাঁসপাতালের দরজা খুল্‌তে ঘণ্টাখানেক দেরী আছে, অথচ হঠাৎ কোথেকে একজন কঠিন রোগী এসে ঠিক দরজার সাম্‌নেই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেছে!—হাঁসপাতাল খুলে সেখানেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কি না—তিনি জান্‌তে চেয়েছেন।...

আবার তোরা মানুষ হ'



আশীর্ব্বাদ ঃ—

রমাই বল্‌লেন—আমাকেই যদি আজ দ্বার উন্মোচনের মহাসম্মান দেওয়া তোমার অভিপ্রায় থাকে দিদি, তা হ'লে আমার মতে—এক্ষুণি হাঁসপাতালে সে রোগীকে ভর্ত্তি করা হোক্; ভর্ত্তি করাও যদি না হয় তো তার চিকিৎসার জন্য যা-যা দরকার, তার যেন কোনটার ত্রুটী না হয়।......

* * * যথাসময়ে সমস্ত উৎসবাদি শেষ হ'য়ে গেলে মেনকা নবাগত রোগীটিকে দেখ্‌তে গেল। সঙ্গে ছিলেন রমাই পণ্ডিত।

রোগীর তখন চিকিৎসার গুণে জ্ঞান ফিরে এসেচে।

মেনকা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে?

রোগী তার রুগ্ন ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে—আর ভাল......কোন্ রকম ক'রে যাওয়ার দিনটির অপেক্ষা করা!...সে দিনের তো আর আগা-পিছু নেই!...তারপর প্রলাপ বক্‌বার মতই বল্‌তে সুরু করলে—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা...দুনিয়ায় কেউ নেই!......অর্থ তাও নেই...নইলে আজ হাঁসপাতালে...এই ভরতপুরে!...

মেনকা তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়্‌তেই রমাই পণ্ডিত জোরে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁগো, তুমি কি সেই উমেশ চাটুয্যের ছেলে প্রকাশ?

প্রকাশ চোখ মেলে চাইলে। তারপর হাসবার চেষ্টা করতে করতে বল্‌লে—হ্যাঁ, প্রকাশ চাটুয্যেই বটে!...উমেশ চাটুয্যের ছেলে।

মেনকা তখন খাটের একপাশে ব'সে, প্রকাশ বাবুর মাথাটায় হাত বুলোতে সুরু ক'রেছে।

প্রকাশ অত্যন্ত দুর্ব্বল—ক্লান্ত। ডাক্তারে তাকে বক্‌তে নিষেধ করেছিল, কিন্তু সে বারণ শুনলে না, মেনকার হাতখানা এক হাতে চেপে ধরে একটা তৃপ্তির শব্দ করলে—আঃ,...তারপর বল্‌তে লাগলো—

বুঝ্লেন পণ্ডিত মশায়!...আমার মা টি—ভাল হ'য়ে থাক্বার জন্যে আমাকে অনেক রকমের সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন; কিন্তু পাপ জিনিসটা পাপীর কাছে এমনি মজাদার...মোহ কাটাবার শক্তি পেলাম না।...সমস্ত জীবন ধরে' লোকের কাছে সত্যি-মিথ্যের জাল বুনে বুনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছি, আবার লক্ষ লক্ষ লোক্ শাপও দিয়েছে। ধর্ম্মের সূতোটাকে ব্যবসার সুরু থেকেই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম—তাই পাপের আঁধারেই জীবন চ'লে যেতে ব'সেচে। উন্নতির আলো আর চোখে দেখ্লাম না।...

খুব হাঁপাতে লাগ্লো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠ্লো।

মেনকা বল্লে—আজ চুপ করুন, কাল না হয় বল্বেন।

প্রকাশ বল্লে—কাল বাঁচি তবে তো শুন্বি মা!...কিন্তু ব'লতে পারতাম—যদি সামান্য একটুখানি...বেশী না—দু' আউন্স্...

ডাক্তার বল্লে—আর মদ খাবেন না।

এমনি সময় ভবতোষ এসে পড়লো, তাকে দেখে—প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেল্লে।

ভবতোষ তার চোখ মুছিয়ে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াতে যাবে,—ইতিমধ্যে "ভাই" বলে একটা আবেগময় ক্ষুদ্র চীৎকার করে' প্রকাশের প্রাণটুকু দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেল।...

শান্তিরাম সৎকারের ব্যবস্থা করতে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে।...

সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভবতোষ বল্তে লাগলো—পরশু দিন ক'লকাতায় গিয়ে যখন আমাদের বাড়ীতে হাজির হ'ল,—তখন ঘণ্টায় ৪।৫ বার রক্ত উঠ্ছিল। অতিরিক্ত মদ খেয়ে লিভারের বেদনা হ'য়েছিল বোধ হয়।

মেনকা মৃতের আপাদ মস্তক সাদা চাদরে ঢেকে দিয়ে, উঠে দাঁড়ালো। তারপর ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করলে, এতদিন কোথায় ছিলেন—কি করছিলেন—কিছু ব'লেছেন?

ভবতোষ বল্‌লে—হ্যাঁ, আমি তো জান্‌তাম না যে, তুই সেই দেড় লাখের চেক্‌টা দিসনি। আমি ভেবেছিলাম—টাকাটা নিয়ে প্রকাশ হয় তো ঢাকা বা চাটগাঁ সহরে একটা থিয়েটার খুলেচে।...তোর কাছ থেকে পনের হাজার টাকা নিয়ে, সে মতিহারীতে গিয়ে অনেক দিন ধরে' মেয়ে যাত্রার দল চালায়, তারপর আস্তে আস্তে আবার সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়ে; আর অধঃপাতের পথেই তো বাস করতো কি না!...... মোটামুটি ঘটনা বলতে পেরেছিল, খুঁটিয়ে আমি জিজ্ঞেস করিনি।...... যখন শুন্‌লে—ভরতপুরে মেনকা বাস করছে, অনেক রকম ভাবে দেশের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে, তখন আর দাঁড়াতে চাইলে না।...ব'ললে—সেরে উঠে দেশের কাজ করে' পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব—সে আশা নেই, তবু আমি মার কোলে মর্‌বার সৌভাগ্য পাবো।

তিন দিন পরের কথা।

আজ প্রকাশ বাবুর শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেলে, ভবতোষ ক'লকাতায় চ'লে গেছে।

অনেকখানি রাত্রিতে, বৈঠকখানায় এসে শান্তিরাম দেখ্‌লে—রমাই পণ্ডিত বাড়ী চলে গেছেন। সে চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাতেই মেনকা দোতলায় তার বস্‌বার ঘরে এসে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলো।...

শান্তিরাম ঘরে ঢুকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আজ যদি কেউ এসে ব'লতো যে, শান্তিরাম তোমাকে পৃথিবীটা দান করা হ'বে,—তাতে

আমার যে আনন্দ হ'ত, তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী আনন্দ পেলাম মেনকা, যখন শুনলাম যে, লাট সাহেব তোমাকে কি-একটা উপাধি দিতে চেয়েছেন।

মেনকা ব'ললে—ওসব বাজে কথা। তা ছাড়া আমি না নিলে তিনি দেবেন কাকে?...কিন্তু এত রাত্তিরে যে?......আনন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করতে না কি?

শান্তিরাম হাসি হাসি মুখে ব'ললে—সত্যিই তাই। ভালবাসার এমনি মোহ—এমনি টান!...কিন্তু আর আমি সবুর করতে পারছিনি মেনকা! তুমি হুকুম দাও—আমি আয়োজন করি। দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, স্বামী তোমার বেঁচে নেই, সুতরাং তুমি বিধবা! পল্লী-সংস্কারের কাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করাও একটা মস্ত অঙ্গ—এ বোধ হয় তুমি মানো।...তুমি ছাড়া আর আমি বাঁচবো না, জল ছাড়া মীন কি বাঁচে, মিনু!

মেনকা বল্‌লে—আমিও তাই ভাব্‌ছি। অবশ্য আপনার কথা অনেক দিক দিয়েই সঙ্গত। আচ্ছা, আমি এ নিয়ে আজ সমস্ত রাত্রি চিন্তা করবো। তবে জেনে রাখুন—পল্লী সংস্কারের এ-ও যে একটা অঙ্গ, আমি তা' মোটেই অস্বীকার করি না।

শান্তিরাম ভাব্‌লে—আকাশের চাঁদটা আজ আপন ইচ্ছায় আকাশ ছেড়ে তার হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে! বল্‌লে—এ আমার বহুত সম্মান মেনকা, শুধু আমার নয়—সমস্ত সমাজের!...তাহ'লে আমি আশায় বুক বাঁধতে পারি?

মেনকা মাথা নত ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—আপনি কাল সন্ধ্যের সময় একবারটি আস্‌বেন।

উৎফুল্ল শান্তিরাম মেনকাকে আলিঙ্গন করতে গেল। ব'ললে—দূরে সরে' যেয়োনা তুমি।...এতকাল ভেতরে ভেতরে কী জ্বালাই না ভোগ করেছি।......তোমার সঙ্গে মিলন—এ বিধাতার দুর্লভ দান!—এসো একবার—

মেনকা ঘর থেকে চলে যাওয়ার সময় বল্লে গেল—আগে কথাবার্ত্তা পাকা হোক্ তার পর।...পুরুষমানুষের ধৈর্য্য থাকা উচিত।...

পরের দিন সকাল থেকে অনেক বেলা পর্য্যন্ত মেনকা রমাই পণ্ডিতের সঙ্গে অনেক বিষয়ের পরামর্শ কর্‌লে। আরব্ধ কাজের সম্বন্ধেও বিস্তর আলোচনা হ'লো।

......সেই দিনই শীতলরামকে আস্‌বার জন্য চিঠি লিখে দেওয়া হ'ল।...

সন্ধ্যার সময় নেড়া মাথায় সিল্কের পাগড়ী জড়িয়ে, বিচিত্র বেশ ভূষা ক'রে শান্তিরাম সোজা অন্দরের মধ্যে চ'লে এলো।

মেনকা যত্ন করে' তাকে বসালে, অনেক কথার আলোচনা কর্‌লে, নানারকম জলখাবার খাওয়ালে, কিন্তু আপনা হ'তে শান্তিরামের প্রস্তাবের কোন প্রসঙ্গই তুল্‌লে না।

শান্তিরাম বল্‌লে—তোমার এ খাপ্‌ছাড়া আদর-যত্ন আমার ভাল লাগে না, মেনকা। আগে জবাব দাও—আমি আয়োজন কর্‌বো কি না!...ধৈর্য্য সত্যিসত্যিই সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে আমার।—ব'লে সে বিলোল বাহুদ্বয় প্রসারিত করে' প্রমত্তভাবে এগিয়ে এলো।

মেনকা হঠাৎ চোখ মুখ রাঙা ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—দারোয়ান্!...তার পর বাঁ হাত দিয়ে শান্তিরামের নেড়া মাথার পাগ্‌ড়ী খুলে ডান হাত দিয়ে গালে মাথায় এম্‌নি জোরে চার্ পাঁচটা থাপ্পড়

মারলে যে, শান্তিরামের চোখ দুটো আপনা হ’তে বুজে এলো। বন্ বন্ ক’রে তার মাথাটা ঘুর্‌ছিল!

দারোয়ানকে আগে থেকে ব’লে রাখা ছিল। দরজার সাম্‌নে আস্‌তেই, মেনকা হুকুম দিলে—গর্দ্দান্ পাকড়ে দূর ক’রে দাও!...

* * * *

শীতল এলে, মেনকা ব’ল্‌লে—ক’লকাতায় আপনার কাজ আমি চালাবো। আপনি এখানকার কাজ চালান—আমি হপ্তায় একদিন ক’রে এসে শুধু দেখে যাব।...তারপর রমাইকে প্রণাম ক’রে বল্‌লে—সমস্ত লোক যখন মানুষ হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হবে, তখন আর আমি দেশ ছেড়ে এক পাও বিদেশের দিকে বাড়াতে চাইবো না। ওরা মানুষ হোক্—ওদের মানুষ করুন!...



বিনা সংবাদে কন্যাকে অতর্কিতভাবে ফিরে আসতে দেখে, বিস্মিত ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে—হঠাৎ চ'লে এলি যে মা?

মেনকা মুখখানা অসাধারণ গম্ভীর করে, জবাব দিলে—ম্যানেজার বাবুকে আর পণ্ডিত দাদাকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এসেচি বাবা!... তোমার কথাই সত্যি, আমার স্থায়েমী হ'য়ে ওখানে বাস করা এখন চ'লবে না, তার বিলম্ব আছে।

ভবতোষ এবার কিন্তু হাস্‌তে পারলে না। একদিন ছিল, যখন কন্যার এই খেয়ালটাকে নিছক্ পাগ্‌লামি ছাড়া সে অন্য কিছুই ভাব্‌তে পারতো না। কিন্তু আজ—আঁধার রাজ্যে আলোর পতাকা তুলে দিয়ে, হঠাৎ সেখান থেকে স'রে চ'লে আসাটা তার ভাল লাগ্‌লো না। ব'ললে —অভিমান তুই কার ওপর করলি মিনু? যারা মানুষ নয়, তাদের কাছে মনুষ্যত্বের দাবী করা তো উচিত নয় মা! এতদূর এগিয়ে এসে, আবার পেছন ফিরে দাঁড়ানো—এ যে ভগবানের কাছেই অপরাধী হওয়া।

মেনকা ব'ললে—ফিরে তো আসিনি বাবা! দরকার হলে আবার আমি যাবো বই কি। তবে অভাব টের না পেলে, কেউ কোন দিন জিনিসের কদর বোঝে না বাবা! আমার অভাব ওরা মর্ম্মে মর্ম্মে যেদিন বুঝবে, আমি সেইদিনই গিয়ে হাজির হবো। তার জন্যে তুমি ভেবো না বাবা!

...ভবতোষ কারবার দেখ্‌তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল। মোটর-খানা কেবলই হর্ণ বাজাচ্ছে।

মেনকা ব'ললে—তুমি আর দেরী করোনা বাবা! বোধ হয় একটা বাজ্‌বে। পণ্ডিত দাদা আর শীতলবাবু থাক্‌তে আমার কাজ সমান ভাবেই চ'লে যাবে—এ বিশ্বাস আছে বলেই তো তোমার কাছে ছুটে এলাম। তা-ছাড়া এই বয়েসে তোমাকেই বা দেখ্‌বে কে বাবা?...

ভবতোষের চোখ্ দুটো ছল ছল করছিল। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললে—ছেলেটাকে তা হ'লে একটা দিন ঠিক ক'রে ঘরে নিয়ে আয় মিনু!......দিনকতক পরে সেও ত আমার সাহায্য করতে পারবে। না না এর ওপর আর আপত্তি তুলিসনি মা! আমরা হিন্দু, সুতরাং জল-পিণ্ডের জন্যেও যে আমাদের ভাবনা আছে।

মেনকা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—তাড়াতাড়ির সময় ওসব কথা থাক্ না বাবা! তুমি ফিরে এলে ওবেলায় কথা কইবো।

ভবতোষ চ'লে গেল।

মেনকা স্নান আহার সমাপনান্তে, বিশ্রাম কক্ষে ব'সে কতকগুলো দরকারী চিঠি পত্র লিখে, তখনই ভৃত্য দিয়ে সে গুলো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর তার মগজে মগজে একটা নূতন চিন্তা এসে দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধে ফেল্‌লে,—যা আজ দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ মধ্যে দু' পাঁচ দিন ছাড়া তার মাথায় একদণ্ডও আসেনি।

...পোষ্যপুত্র গ্রহণ!...এ যেন অতৃপ্ত মনকে জোর ক'রে তৃপ্তির গান শোনানো! যা নেই তা অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাতৃ-হিয়ার পরতে পরতে সন্তানের জন্য এই যে নিদারুণ ব্যথা—এ ব্যাথার শান্তি কি জঠরের সন্তান ছাড়া অন্য কারুর দ্বারা হওয়া সম্ভব? পরের ছেলেকে আপন করা—তা আবার শাস্ত্রের সুকঠোর বেষ্টনী দ্বারা নিগূঢ়ভাবে

আটক্ ক'রে। এক মাকে বঞ্চিত ক'রে নিজে 'মা' হওয়ার পাপ কি সত্যসত্যই পাপ নয়!...দীর্ঘ কাল—কত সুদীর্ঘ দিন-যামিনী এক এক করে অতীতের কোলে ঢ'লে প'ড়েছে, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম, কত শীত-বসন্ত-শরৎ পালা সাঙ্গ ক'রে পালিয়ে গেছে—আবার ফিরে এসেচে, কিন্তু মেনকাকে কাঁদিয়ে যে গেছে—সে তো কই এলো না ফিরে!

...কিন্তু সে কি আছে এখনো? আজও কি সে তার একান্ত আপনার জনকে মমতা-পাশ ছিন্ন ক'রে দূরে ঠেলে ফেলে, দূর দূরান্তে বিচরণ করতে বেঁচে আছে?...হয়তো নাই, নয়তো আছে, কিন্তু মেনকার পক্ষে আজ সবই সমান। যে তাকে চাইলে না—তার পরিপূর্ণ লাবণ্য ঢলঢল যৌবন-সম্ভার যে হেলায় পদদলিত করে ভুলে দূরে স'রে রইলো,—আজ বিরহ-সন্তপ্তা মেনকা তার জন্য চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর কি-ই বা করতে পারে?

আত্মীয় ব্যথাতুর পিতার এই আকুলতা, পোষ্যপুত্র গ্রহণের ঐকান্তিক ব্যগ্রতা—সব হয়তো মিটে যেতো, আজ সে যদি শুধু ফিরে এসে বৃদ্ধ পিতার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তো—আমি আছি তোমার। আমিই তোমার শত পুত্রের আসন একা দখল ক'রে থাক্‌বো। তুমি নিশ্চিন্ত হও! কিন্তু বৃথা আশা! আস্‌বার হ'লে এখনো কি সে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতো?

—মনে তো পড়ে না! সেই কবে ধুমধাম করে এই ক'লকাতার বাড়ীখানাকে বিপুল সাজ সজ্জায় সাজিয়ে-রাঙিয়ে-হাঁসিয়ে তার বর বধূ-বেশী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল—মাত্র এই কথা ছাড়া বরের মুখ-খানাও আর স্মৃতিপানে টেনে আনা যায় না!...ওঃ নিষ্ঠুর বীভৎস বিধিলিপি!...আপনকে এত রূঢ়ভাবে পর ক'রে রাখার ব্যবস্থা!!...

...ভবতোষ সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এলো। সঙ্গে তার পাঁচ-ছ' বছরের এক শিশু।

মেনকা বিস্মিত এবং বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—এ আবার কাকে ধ'রে আনলে বাবা? কে ও?

ভবতোষ জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হেসে ব'ললে—যে ছেলেটির কথা তোকে ওবেলায় ব'লে গেলাম, সেই। কথা তুলতে না তুলতেই ওর মা-বাপ ব'ললে—যাগ-যজ্ঞি যখন হবে তখন হবে, আপাততঃ ওকে নিয়ে পোষ মানাও।......হাজার হোক্ নতুন জায়গায় আসতে হচ্ছে কিনা।

মেনকা গম্ভীরভাবে শিশুর মুখখানার পানে চেয়ে রইলো।...... হায়রে! অর্থাভাব! মা হ'য়ে সন্তানকে বিক্রয় করা—এত বড় পশু-প্রবৃত্তি বুঝি মানুষের পক্ষেই খাটে।

ভবতোষ বিশ্রাম করতে করতে ব'ললে—ছেলেটাকে কিছু খাবার দিস্ মা!...খাবার, খেলনা পাঁচ রকমের পাঁচটা ভাল জিনিস পেলেই সব ভুলে যাবে।

শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে মেনকা ব'ললে—ভুলতে আমি দোব না বাবা! ছেলে তার মাকে ভুলে যাবে! একি ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে সইবে বাবা?...তারপর আর সে দাঁড়ালো না।

ভবতোষ ভাবলে—দু'চারবার বুকের কাছে চেপে ধরলেই আর ছাড়তে পারবে না।...

...রাত্রি তখন বারোটারও বেশী।

ভবতোষ নিদ্রাভিভূত, মেনকা এসে ডাকলে—বাবা! বাবা!

ভবতোষ চোখ কচ্‌লে উঠে বসলো। আলোর সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে দরজা খুললে।

শিশু-ক্রোড়ে মেনকা সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

ভবতোষ বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্লে—কি? এখনো ঘুমোসনি? ছেলে নিয়ে আদর হচ্ছিল বুঝি?...পাগ্‌লি কোথাকার।

মেনকা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—বংশ রক্ষে করতে হয়তো তোমারই করা উচিত বাবা!......তুমিই একে যাগ যজ্ঞি ক'রে বংশধর করো। আমার বংশ থাক্‌লে তোমার কি?...কপালে আমার যা লেখা আছে তা তো ফ'লবেই। অদৃষ্ট নিয়ে আমি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট থাক্‌বো।

ভবতোষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'ললে—ব্যাপার কি মিনু? হঠাৎ এমনধারা চ'টে উঠ্‌লি কেন?

মেনকা ব'ল্লে—চটা চটির কথা নয় বাবা! ছেলেতে আমার কাজ নেই। হয় একে নিজে বুকে ক'রে ঘুম পাড়াও, নয় তো যার ছেলে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তুমি কি জানো না বাবা! মার বুক থেকে তার বুকের বাছাকে ছিনিয়ে আনার কত পাপ?...ওর কান্না আমি থামাতে পারলাম না। বাড়ী না গিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। আমি সোফারকে গাড়ী ঠিক করতে ব'লে এসেচি, তুমি কাপড় ছেড়ে ওকে নিয়ে যাও। পূর্ব্বজন্মে বহু পাপ আমার করা ছিল বাবা! তাই এ জন্মে মেয়ে মানুষের সব চাইতে যে বড় ব্যথা, সেই ব্যথায় জ্ব'লে যাচ্ছি। আর এ জীবনে পাপের বোঝা বাড়াতে পারবো না।...আমাকে রেহাই দাও বাবা!...সংসারের পথে ঘাটে কত শত কাজ, অকাজের ব্যথায় অপমানিত হচ্ছে, আর এম্‌নি দিনে বংশরক্ষাটাই কি তোমার আমার উঁচু কাজ হবে বাবা?

ভবতোষ সামান্যক্ষণ নীরবে চিন্তা ক'রে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—গাড়ী আনতে হুকুম পাঠিয়েছিস্?

—হঁ্যা।

তখনই ফটকে মোটর গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠ্‌লো।

ভবতোষ শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে ব’ললে—আয়রে বাছা! তোর মা’র কাছে রেখে আসি।

শিশুকে নামিয়ে দিয়েই—“এক মিনিট সবুর করো বাবা, আমি আস্‌চি।” ব’লে তাড়াতাড়ি মেনকা গৃহান্তরে চ’লে গেল। এবং দু’ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে পিতার হাতে এক তাড়া নোট দিয়ে ব’ললে—পাঁচশো টাকা আছে। কাঙালী মাকে দিয়ে এসো। অভাবে যারা সন্তান বেচে খায়, তারা সত্যিসত্যিই অভাবী।

* * * * *

পরের দিন খুব প্রাতঃকালে মেনকা শয্যা ত্যাগ ক’রে এলো চুলের রাশ গোছাতে গোছাতে, সুমুখের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই, এমন একটা আশ্চর্য্য এবং অভাবনীয় ব্যাপার দেখ্‌তে পেলে, যা আজকালকার দিনে অত্যন্ত সাধারণ দৃশ্য হ’লেও তার চোখে সম্পূর্ণই নূতন।

সে দেখ্‌তে পেলে, তাদেরই প্রকাণ্ড ফটকটার সাম্‌নে কে একটা লোক অজ্ঞান অবস্থায় প’ড়ে আছে এবং তার চার পাশ ঘিরে অনেকগুলো ভদ্র অভদ্রের দল হাসি-ঠাট্টা করছে তবু সেই সংজ্ঞাহারার প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা দেখাবার চেষ্টা করছে না। পথের পথিকও তার পথ চলা মুহূর্ত্তের তরে বন্ধ রেখে, সেই হতভাগ্যের পানে চেয়ে তীব্র বিদ্রূপ বাণী বর্ষণ করতে ইতস্ততঃ করছে না। মেনকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোখ মুছলে, তারপর ভৃত্যকে সমস্ত ব্যাপার জান্‌বার জন্য নীচে পাঠিয়ে, তেমনি ভাবেই অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো। কিন্তু ভৃত্য ফিরে না আস্‌তেই

দুজন পুলিশ পাহারাওলা এসে লোকটাকে লাঠির গুঁতোয় অর্দ্ধচেতন ক'রে, ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে চ'লে গেল।

ভৃত্য এসে জানালে—মাতাল।

মেনকা দাঁতে দাঁত চেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলে, অসংযত বস্ত্র অসংযত রেখেই সে আবার বিছনায় শুয়ে পড়লো।...মাতাল! মদ খেয়ে এ হেন প্রায়শ্চিত্ত!...তার প্রকাশ চাটুয্যের কথা মনে প'ড়ে গেল। ...হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত...দারুণ প্রায়শ্চিত্ত!

সেইদিনই দুপুরের সময় মেনকা ভরতপুরের চিঠি পেলে—দুখানা, একখানা রমাই পণ্ডিত লিখেছেন অন্যখানা ম্যানেজার শীতলরাম। দুখানা চিঠিরই মর্ম্মার্থ এক!—

শান্তিরাম পাগ্‌লা শিয়াল কুকুরের মতই দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে এবং দেশের লোককে অযথা ক্ষেপিয়ে তুলে, মেনকার নব প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিকে সকলের চক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য দিনরাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমাই পণ্ডিত তাঁর পত্রে জানিয়েছেন—"তুমি চিন্তিত হ'য়ো না দিদি! অসৎলোকেরা সৎকাজের বিরুদ্ধে এমনিকরেই দাঁড়ায়। এ নিয়ম সংসারে নূতন নয়। চিরাচরিত প্রথাকে সহজে ভাঙা যায় না। কিন্তু যা সুপ্রথা এবং সুফলদর্শী তা একদিন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। যে হেতু ভগবানের আশীর্ব্বাদ সেখানে ধারায় ধারায় বর্ষিত হচ্ছে।...অন্ধকারের জীব যারা, সহসা চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল আলো পেলে দৃষ্টিকে স্থির রাখতে পারে না। আলোটা তাদের যতক্ষণ না গা-সহা এবং দৃষ্টি-সহা হয়।"

মেনকা আপন মনেই খানিকক্ষণ হাস্‌লে। শান্তিরামের অন্তরের

কোন্‌খানে যে ব্যথার প্রস্রবণ লুকিয়ে আছে, তা আর কেউ জানে না, জানে একমাত্র সেই-ই।—আজ ব্যথার প্রস্রবণ থেকে উত্তপ্ত অত্যাচারের উৎস ছুটে বেরু'চ্ছে—একমাত্র ব্যথা-শান্তির আশু প্রলেপটা প্রস্রবণের মুখে মুখে লাগাতে না পেরেই।

আজ আর কোন চিঠিপত্র লিখ্‌তে তার ইচ্ছা হ'ল না। সারা মধ্যাহ্ন বেলায়, 'মদের পরিণাম এবং মাতালের ভবিষ্যৎ অবস্থা' শীর্ষক খুব লম্বা চওড়া একটা প্রবন্ধ লিখে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলোর আফিসে পাঠিয়ে দিলে। প্রাতঃকালের দেখা সেই সংজ্ঞাহীন মাতালের অবস্থার কথা তার কেবলই মনে পড়ছিল।

রাত্রে ভবতোষ আহারে বস্‌লে মেনকা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা বাবা! লোকে মদ খায় কেন?

ভবতোষ হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—মোক্ষ পাবে ব'লে।

মেনকা বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ললে—বাজে কথা নয়, সত্যিকরে বলো—কেন লোকে ও বিষ খায়?

ভবতোষ ব'ললে—এর কোন যুক্তি তর্ক আমি জানিনে মা! যাকে তুই দোষ বলছিস, আমিও তাকে গুণ বলি না। কিন্তু মাতাল না-হ'লে মদের গুণাগুণ তো জানা যায় না, ব'লেই আবার হেসে উঠ্‌লো। তার-পর ব'ললে স্বাভাবিক অবস্থাকে অস্বাভাবিক করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং অর্থের পক্ষে দুইএর পক্ষেই অনিষ্ট কর। সংসারে বাঁচতে হ'লে সংসারীকে ঐ দুটো জিনিসের ওপরই বেশী লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়। কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলি যে? মাতালের দুর্গতি টুর্গতি দেখে ফেলেছিস বুঝি?

মেনকা সকালকার ঘটনাটা ধীরে ধীরে প্রকাশ ক'রে ব'ললে।

ভবতোষ ব’ললে—এই ক’লকাতা সহরে, ক’লকাতা সহরই বা বলি কেন—আমাদের এই ভারতবর্ষে, ফি দিনই কত লোকের এমনতর অবস্থা হচ্ছে কে তার হিসেব রাখে মা! কত মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন, কত সতী পতি-বিরহে বেঁচে থেকেও মৃত্যু যন্ত্রণা সইছেন্ কত পুত্র-কন্যা অনাহারে শুকিয়ে মরছে,—কেউ তার হিসেব রাখে না। ঘরের কড়ি সাধকরে পরের হাতে তুলে দিয়ে, এমন গরীব মাজার সাজঘর—এদেশে আর নেই মেনকা!

মেনকা জিজ্ঞাসা করলে—সহরে না হয় চারধারে চার লক্ষ রকমের প্রলোভন রয়েছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে? সেখানেও কি এই ব্যাপার হচ্ছে বাবা? সেখানকার লোকেও এম্‌নি করে মাতাল হ’য়ে পুলিশের মার-খায়? এম্‌নি ক’রে না-খেতে পাওয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মা-ভাই-বোন্‌দের পায়ে ঠেলে রেখে শুঁড়ীর ভুঁড়ি মোটা করে? মদওয়ালার তেতলা চার-তলা দালান বানিয়ে দেয়?...সেখানে তো বড় লোক নেই বাবা! তারা টাকা পাবে কোথায়?

ভবতোষ আহার সমাধা করে উঠে দাঁড়িয়ে ব’ললে—সর্ব্বত্রই সমান অবস্থা মিনু! মাতালের চাল ডাল কিন্‌তে গেলে দোকানে ধার করতে হয়, ধার না মিল্‌লে উপোষ দিতে হয়, কিন্তু শুঁড়ীর দোকানের জিনিষ তো ধারে দেওয়ার আইন নেই! পাই-পয়সাটি নগদা বেচ্‌তে হবে। গরীব দেশের অর্থটাই হচ্ছে দেশবাসীর দেহের রক্ত, সে রক্ত চুষে খেয়ে মাতালরা নেশা করে, দেহের রক্ত মুখে পুরে দিয়ে পাগল হ’য়ে নেচে বেড়ায়, শেষে বদ্‌হজমে জ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এ কথার তো শেষ নেই মা!—এ ব’ল্‌তে গেলে সারা রাত্রে শেষ হবে না, মদ-গাঁজা-আফিং-চরস এ গুলো সব মূর্খ কিম্বা বিবেক হীন মানুষকে

যাঁতায় পিষে মেরে ফেলার বিষ-বড়ি......রাত ঢের হ’য়েচে মা! খাবি যা।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মেনকা রান্নাঘরে হাজির হ’ল। পাচিকা আহারের থালাখানা আসনের সুমুখে ধরতেই, সে উদাস দৃষ্টিতে আহার্য্যের প্রতি চেয়ে চেয়ে সহসা উঠে পড়লো—নাঃ খাবোনা কিছু।

পাচিকা অবাক্ হ’য়ে চেয়ে রইলো।

মেনকা টলতে টলতে আপন প্রকোষ্ঠে এসে, বিছানায় নেতিয়ে পড়লো। মনে মনে ব’ললে—আপন দেহের রক্ত আপনি চুষে খেয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ!...এই আমার দেশবাসীর দুর্দ্দশা!...মহামহিময় দেশ-নেতৃগণের অমানুষিক চেষ্টার কথা, তাঁদের তীব্র যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতার কথা এক এক ক’রে মেনকার তন্দ্রাহারা নয়নের সম্মুখে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লে! সারারাত্রির মধ্যে একবারও সে ঘুমুতে পারলে না। সে আরো ভাব্‌লো—যাদের বাঁচাতে গিয়ে সে রাশরাশ অর্থ জলের মত অকাতরে ব্যয় করেছে এবং এখনো করছে, তারা, তার সেই স্বগ্রাম বাসী ভরত-পুরের অধিবাসিরাও কি এম্‌নি মূর্খ! এম্‌নি করেই কি তারা দেহের রক্ত চুষে খায়! পরণের অর্দ্ধ ছিন্ন বসন বেচে, ননীর পুতুল পুত্র-কন্যার কোমল হাতের অলঙ্কার বেচে, সতী পত্নীকে উলঙ্গ রেখে মদ খায়! গাঁজা টানে—তারাও!......

...ভোরের বাতাস বইতে সুরু করেছে।

—মেনকা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌লো।

খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে, উদার অনন্ত বিস্তৃত আকাশের পানে চেয়ে সে প্রতিজ্ঞা করলে—সমগ্র ভারতকে রক্ষা করতে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা আছেন, কিন্তু ক্ষুদ্র ভরতপুরকে রক্ষার ভার সেই-ই স্বহস্তে গ্রহণ

আবার তোরা মানুষ হ'



..."ছেলের অসুখ, মেয়ে মরছে,—
তাতে আমার কি ?—তোমরা নিপাত যাও

করবে।......মেনকা আকাশের দিকে চেয়ে, ম্লান স্তিমিত নক্ষত্রের পানে চেয়ে দুহাত বাড়িয়ে ভগবানের আশীষ ভিক্ষা করলে—সহায় হও প্রভু!—সর্ব্বস্ব পণ রইলো!—সহায় হও তুমি।......মদ খেয়ে যারা মাতাল সেজে আপন পায়ে সর্ব্বনাশের বেড়ী প'রেছে, অন্যায়কে না জেনে, যারা ন্যায়ের মাথায় লক্ষ অপমানের কষাঘাত করেছে,—তাদের রক্ষার ভার আজ আমার হাতে দাও,—যেন পারি,—পারি যেন ঠাকুর!

উষা এলো—তার চরণ-মঞ্জীর বাজিয়ে।...আকাশ রক্তরাগ-রঞ্জিত।

মেনকা ধীরে ধীরে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করলে—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং......



শীতের প্রারম্ভ।

মেনকা মোটরে চেপে গঙ্গাস্নানে গেছলো। ফিরে আস্‌তে আস্‌তে ভাবলে—যা থাকে কপালে এই মাসেই আর একবার ভরতপুরে যাবো। দূরে দাঁড়িয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন—এ যেন আপনার মনকেই প্রবঞ্চনার বাণী শোনানো।

অকস্মাৎ মোটর গাড়ীর গতি রুদ্ধ হ'য়ে যেতেই, সে সুমুখে চেয়ে দেখ্‌লে—অতি শীর্ণা কঙ্কালাবশিষ্টা এক নারী আর তার কোলের কাছে এক বালক,......ভগবান রক্ষা করেছেন—নইলে আজ মোটরের তলে প'ড়ে অসহায় দুটী প্রাণী জীব-জগত থেকে অনিচ্ছায় বিদায় নিত।

মেনকা শশব্যস্তে গাড়ী থেকে নেমে নারীকে কাছে টেনে আন্‌লে, এবং বালককে বুকের কাছে চেপে ধরে আদর জানালে,...চোখ বেয়ে তার অবিরল অশ্রুধারা ঝরছিল।

মেনকা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে নারীকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের বাড়ী কোথা? গঙ্গা নাইতে এসেছিলে?

নারী ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললে—বাড়ী? বাড়ী নেই আমাদের। গঙ্গা নাইতে আসিনি। ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম।

—ছেলেটি তোমার কে?

—আমার পেটেই জন্মেছে। পোড়া অদৃষ্ট আমার চেয়ে ওরই বেশী।

মেনকা আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করে প্রথমে বালকটিকে

গাড়ীতে তুলে নিয়ে মেয়েটিকে ব'ললে—উঠে এসো ভাই! বাড়ী যখন নেই বলছো—তখন আমাদের বাড়ীতেই আজ থাকবে।

ভিখারিণী ইতস্ততঃ করছিল। মেনকা ব'ললে—ভয় নেই, আমি তোমাকে অযত্ন করবো না। তারপর বালককে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি বাবা?

—আনন্দজীবন দত্ত।

মেনকার সমস্ত দেহ-মন ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠ্লো! ও যে তারকাবিহীন নয়নের ভিতর পাথরের তারকা বসানো! উপরে তার রঙীন চশ্মার আবরণ।...নিরানন্দের প্রতিমূর্ত্তি তবু তার, নাম আনন্দ-জীবন!

নারী তখনো পথে দাঁড়িয়ে।

মেনকা মিনতির সুরে ডাক্লে—এসো ভাই! আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রোনা। আমিও তো মেয়ে মানুষ। ভয় কি? তারপর স্বহস্তে রমণীকে মোটরে তুলে নিয়ে, সোফারকে বললে—বাড়ী চলুন এবার।

পথের মধ্যে কেউ কোনো কথা কইলে না।

ফটকে গাড়ী থাম্তেই মেনকা পরম যত্নে মাতাপুত্রকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল, এবং তারই ঘরে বসিয়ে, পরিচারিকাকে আদেশ করলে—খোকাকে নাইয়ে নিয়ে আয়। তারপর রমণীকে ব'ললে—তুমিও নেয়ে এসো ভাই! আমি তোমাদের খাবার ঠিক করে রাখি।

...ভবতোষ চা খাচ্ছিল।

মেনকা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—দেখেছ বাবা?

—কি মা?

—যাদের এইমাত্র বাড়ী নিয়ে এলাম—তাদের দেখ নি ?

—ও, ভিখিরী বুঝি ?

—আগে ছিল, কিন্তু এখন আর তা নয়। আমি ওদের এই বাড়ীতেই জায়গা দিয়েছি বাবা! আমাদেরই একজন হ'য়ে থাকবে ওরা।... তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বাবা! ওরা সম্ভ্রান্ত ঘরের।

ভবতোষ জোরে হেসে উঠ্‌লো। ব'ললে—পাগলি!...তোমায় আমি কি বুঝেছি যে—ওরা ছোট লোকের ঘরের।

মেনকা অপ্রতিভ হ'ল, এবং সুখী হ'য়ে ব'ললে—তবু একবারটি তোমায় জানিয়ে রাখলাম বাবা।...ছেলেটিকে দেখেছ ?—দেহ-মনের মধ্যে কোথাও আনন্দের পরশ নেই, তবু ওর নাম আনন্দজীবন।...উপাধি ব'লেছে—দত্ত।

ভবতোষ বিশেষ কিছু ব'ললে না।

মেনকার তাতে বিরক্তি বোধ হ'ল। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো—তোমার যদি সহানুভূতি না থাকে, তা হ'লে কিছু দিয়ে থুয়ে ওদের বিদেয় ক'রে দিচ্ছি বাবা!...আমার কিন্তু বড্ড আশা ছিল—

ভবতোষ হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—তোর কি ছেলে মানুষীটা কোনো দিনই ঘুচ্‌বে না মীনু ? আমি কি বলেছি যে, আমার এতে সহানুভূতি নেই ? তুই যার ভার নিবি, আমি কোন্ মুখে আর কোন্ প্রাণে তাকে অন্য চোখে দেখ্‌বো রে ?...ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ভবতোষের চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো।

মেনকা খুসী হয়ে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললে —আজ থেকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম বাবা! এর মধ্যেই তোমাকে চা খাওয়াটা ছেড়ে দিতে হবে। ও জিনিসটাতে আমাদের দেশের কিছু-

মাত্র উপকার হয় না। চায়ের চেয়ে একবাটী গরম দুধ খেলে হাজার গুণ বেশী উপকার পাওয়া যাবে।

ভবতোষের উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভ'রে উঠ্‌লো।

মেনকা তখন ভয়ানক রেগে গেছে। ব'ললে—হঠাৎ এই হাসিটার কারণ?

ভবতোষ তার চা'য়ের পেয়ালাটা মেনকার সুমুখে ধ'রে ব'ললে—আজ পাঁচ ছদিন থেকে চা আমি ছেড়ে দিয়েছি মীনু!...তোর মাথার ঠিক নেই কিনা, তাই এ ক'দিন দেখ্‌তে পাস্‌নি।

মেনকা হেসে ফেলে ব'ললে—এই প্রথম, মেয়ে হ'য়ে আমি তোমার কাছে পরাস্ত হ'লাম বাবা! নইলে এতদিন আমার বাবাকে আমিই কথায় কথায় উঠিয়েছি বসিয়েছি।...কিন্তু ওরা আবার নেমে আস্‌বে। দেখি...ও হরি...আনন্দর জন্যে আবার জামা কাপড় কিন্‌তে হবে যে, আমাদের ঘরে তো ওসবের চিহ্ন নেই!

ভবতোষ গম্ভীর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—সে তোরই বুদ্ধির দোষে! ছেলেটাকে রাখ্‌লেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত।

মেনকা সে কথায় কান না দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো এবং ভৃত্যকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলে।

...সেই দিনই বিকেলের দিকে, আনন্দর মা সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়লো। দীর্ঘ দিন আহারের অসচ্ছলতা হেতু হঠাৎ গুরু ভোজন তার বরদাস্ত হ'ল না।

ডাক্তার এসে ব'ললে—কলেরা।

মেনকা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

আনন্দর মা কিন্তু একটুও দ'মে যায়নি। মনের জোর তার যথেষ্ট

ছিল। সে সংশয়াপন্ন পীড়ার সময়েও এক এক করে তার অতীত জীবনের সকল ঘটনা মেনকার কাছে জানিয়ে ব'ললে—ভাই! যদি না বাঁচি, আনন্দকে তুমি নিরাশ্রয় কোরো না।

মেনকা ব'ললে—মা কি কখনো তার ছেলেকে নিরাশ্রয় করতে পারে? আজ বাদে কাল যদি ভগবান আমায় তোমারই মত পথের ভিখিরী সাজিয়ে দেয়, তবু আনন্দ নিরাশ্রয় হবেনা দিদি! এ তুমি স্থির জেনে রাখো,—আমার এই শূন্য কোলেই তার একাধিপত্য স্থায়ী হ'য়ে রইলো। আমি যে তার মা।

চিকিৎসার চূড়ান্ত হ'ল, কিন্তু আনন্দর মা বাঁচ্‌লো না। দুঃখিনী যন্ত্রনার হাত এড়িয়ে সম্ভবতঃ স্বর্গেই চ'লে গেল।

মেনকা নিবিড় স্নেহে আনন্দকে বুকে জড়িয়ে ব'সে রইলো।

রাত্রি আটটায় ভবতোষ বাড়ী ফিরে এলো। তারপর যথারীতি মৃত দেহের সৎকার করা হ'ল।

পরের দিন খুব সকালে উঠেই মেনকা বামুন ঠাক্‌রুণকে ব'ললে—আমার আর আনন্দর রান্নাটা আলাদা করে কোরো বামুনদিদি!... আমাদের অশোচ হ'য়েচে। কচি ছেলে হবিষ্যি করতে তো পারবে না, নইলে আমি নিজের হাতেই ওকে রেঁধে দিতাম।

পাচিকা বিস্মিত হ'ল অনেকখানি, কিন্তু কোন প্রশ্ন করলে না।

ভবতোষ ব'ললে—কি ব্যাপার মীনু? আনন্দর অশোচ হ'লেও তোর হবে না কি?...দুদিনেই যে মমতা উথলে উঠ্‌লো!

ব্যথিত হ'য়ে মেনকা ব'ললে—আনন্দ এখনো ঘুমিয়ে রয়েচে, সে জাগ্‌লে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তার বাপের নাম জিজ্ঞেস কোরো বাবা!

তারপর আর সে দাঁড়ালো না। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে অন্যত্র চ'লে গেল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আনন্দজীবন ঘুম থেকে উঠ্‌লো। মেনকা আদর ক'রে তার মুখ হাত ধুইয়ে দিতে গেলে, সে ব'ললে—ও সব আমি পারবো মা! দশ বছর বয়েস হ'ল আমার। ভিক্ষে করতে ঘুরতে আমি এক একদিন বাবুদের মোট ব'য়ে দিতাম।

মেনকা উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আনন্দ প্রশ্ন করলে—আচ্ছা মা!

মেনকা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে—কি বাবা?

—আচ্ছা, এই এত বড় বাড়ী—এইসব বাক্স·বিছানা সব তোমাদের?

—"হ্যাঁ বাবা, সব আমাদের। তোমারই বাবা! সব তোরই" —ব'লতে ব'লতে মেনকা আনন্দকে বুকের কাছে চেপে ধরলে।

—অত বড় মোটর গাড়ী?

—সব—সবরে আনন্দ—সব তোর।

আনন্দ ভ্যাবা চ্যাকার মত চাইতে লাগ্‌লো। তারপর ব'ললে—আচ্ছা, মাকে একদম্ পুড়িয়ে না ফেল্‌লে বোধ হয় বেঁচে উঠ্‌তো। কেন পোড়ালে মা?

মেনকা প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য ব'ললে—তোর দাদামশায় তোকে ডাকছেন আনন্দ! যা বাবা শুনে আয়।...আমার বাবা যে তোর দাদা-মশায় হন, বুঝ্‌লি?

আনন্দ ঘাড় নেড়ে ব'ললে—সে আমি অনেকক্ষণ বুঝে নিয়েছি।... তুমি বুঝি ভাবো আমার বুদ্ধি এখনো হয়নি? আমি খোকা? মায়ের

অসুখ করলে—এক একদিন চার আনা পাঁচ আনা পয়সা আন্তাম—ভিক্ষে ক'রে।

মেনকা মুখে কিছু ব'ললে না, কিন্তু করুণ ও প্রশংসমান দৃষ্টিতে আনন্দর পানে চেয়ে রইলো।...

ভবতোষ দরকারী কাগজপত্র দেখছিল, আনন্দ এসে খুব সপ্রতিভ ভাবে ব'ললে—আমায় ডাকছিলেন দাদামশায়?

ভবতোষ চশ্‌মাটা নাক থেকে খুলে, স্থির দৃষ্টিতে সুকুমার বালকের প্রতি চাইতে চাইতে স্মিত মুখে ব'ললে—হ্যাঁ ভাই! বোসো।

আনন্দ মাটীতেই ব'সে পড়লো।

ভবতোষ ব'ললে—ওখানে কেন? বিছানায় বোসো।

আনন্দ ব'ললে—আমার যে মা মারা গেছেন। নতুন মা ব'লেছেন কম্বল ছাড়া আর কিছুর ওপর ব'স্‌তে হয় না।

গম্ভীর মুখে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আনন্দ, তোমার বাবাকে মনে পড়ে?

—পড়ে বইকি। বাবার কাছেই তো আমি 'ক খ' থেকে 'কর খল' পর্য্যন্ত শিখেছিলাম। তারপর বাবা একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে, মাকে মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়ে পালিয়ে গেলেন, তারপর একদিনও বাড়ী এলেন না। তারপর আমাদের ঘর বাড়ী সব গেল, আমরা ভিক্ষে করে খেয়ে আর রাস্তার 'ফুটে' শুয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম। আচ্ছা দাদা মশায়! মাকে অমন ধারা করে নিত্যি নিত্যি মার ধর করা কি বাবার উচিত?

—তোমার বাবার নাম জানো?

—বা রে!—বাবাকে চিনি আর তাঁর নাম জানিনে! আপনি তো বেশ দাদামশায়!

—কি নাম ছিল তাঁর?

—ছিল নয়—তিনি এখনো আছেন। মা না থাকলে, তিনি বোধ হয় আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তেন। কিন্তু মাকে ছেড়ে তো আমি থাকৃতে পারতাম না কিনা। তা ছাড়া মাকে ভিক্ষে করে খাওয়াতো কে? আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত অজয়কুমার দত্ত। পাণ্ডুয়ায় তাঁর ঘর-বাড়ী ছিল। মা ব'লতেন এখন আর কেউ নেই সেখানে। বাড়ীও নেই।

স্থির দৃষ্টিতে ভবতোষ চাইতে লাগ্‌লো।

অজয়কুমার দত্ত মেনকার স্বামীর নাম, তার বাড়ীও ছিল পাণ্ডুয়ায়। ক'লকাতায় মেনকার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর থেকে, আর সে বাড়ী যেত না; কেন না, বাড়ীতে বাড়ী-ঘর ছাড়া অন্য আত্মীয় স্বজন বা অর্থের সচ্ছলতা তার কিছুমাত্র ছিল না।

ভবতোষ ব'ললে—তোমার নতুন মা-ই এখন থেকে তোমার আসল মা হ'য়ে থাকবেন। তার অবাধ্য হ'য়োনা ভাই!

—সে আমি জানি। মা অসুখের সময় ওকথা অনেকবার আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন।

—"আচ্ছা যাও এখন খেলা করগে।...তোমার মাকে একটিবার পাঠিয়ে দিয়ো।" ব'লে ভবতোষ বৃথাই তাঁর কাগজপত্রে মনোসংযোগ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।

...মেনকা এসে ব'ললে—ডাকৃছো বাবা?

—হ্যাঁ মা!...ভাগ্যিস পুষ্যি পুত্তুর নেওয়া হয়নি।...ওর লেখাপড়া শিখ্‌বার ব্যবস্থা করে দিস্ মীনু! খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

—আজই একজন মাষ্টার ঠিক করে দিয়ো বাবা!...কিন্তু আমি তো আর দেরী করতে পারছি না। কালই আমায় র’ওনা হ’তে হবে।

বিস্মিত ভবতোষ পুনরায় চশ্‌মা খুল্‌তে খুল্‌তে ব’লে উঠ্‌লো—কোথায় রওনা হ’তে হবে?

মাথা নত করে মেনকা ব’ললে—আমি একবার ভরতপুর যাবো বাবা!

ভবতোষ ব’ললে—এই যে সেদিন ব’ললি—এখন আর যাবি না সেখানে?

—কার ওপর অভিমান করে থাকবো বাবা? অভিমান ক’রে ব’সে থেকে তো নিজেরই স্বার্থ নষ্ট হবে।...ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

গম্ভীর ভাবে ভবতোষ ব’ললে—তবে যাও। কিন্তু আনন্দর লেখা-পড়ার যেন বিঘ্ন না আসে।......

...সেইদিন রাত্রিতে, কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরবার মুখে ভবতোষ মোটর থেকে হঠাৎ চীৎকার ক’রে উঠ্‌লো—সবুর—সবুর!...তারপর গাড়ী থাম্‌লে, পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটিকে সাদরে গাড়ীতে তুলে নিয়ে সোফারকে হুকুম দিলে—চালাও।

আগন্তুকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল:—

—তারপর বাড়ী থেকে আসা হ’ল কবে?

—আজ্ঞে আজই, একটা বিশেষ জরুরী কাজে হঠাৎ আস্‌তে হ’ল।

—কাজ মিটে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একটুও বেগ পেতে হয়নি। আজ রাত্রির গাড়ীতেই বাড়ী যাচ্ছি।

—আরে পাগল তুমি!...প্রথমে তো আমার বাড়ীতে না এসে অন্যত্র আহারাদি করাটাই তোমার গুরুতর অপরাধ হ’য়েচে, তার ওপর আজই পালাবার চেষ্টা!

ভবতোষ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লো।

আগন্তুক আর কিছু না ব'লে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলো।

...গাড়ী ফটকে এসে লাগ্‌লো।

ভবতোষ যথেষ্ট সম্ভ্রমের সুরে অতিথির হাত ধ'রে ব'ললে—এসো বাবাজী। আমাদের ঘর-বাড়ী সে কি তোমারও নয়?...ছি ছি!... দেখ দেখি কোথায় কোন্‌খানে উঠেছিলে? কি খেয়েচ না খেয়েচ—

আগন্তুক বিপুল বিস্ময় ও অস্পৃহা নিয়ে ভবতোষের সু-উচ্চ সুধা-ধবলিত সৌধ শিখরের পাঁনে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, হঠাৎ চমক ভাঙ্‌তেই ব'ললে—আজ্ঞে, আর কখনো এ অপরাধ করবো না।

ঘরে ঢুকে, অতিথিকে বসিয়ে, ভবতোষ ডাক্‌লে—ওরে আনন্দ! শীগ্‌গীর একবার তোর মাকে ডেকে দিস্।

আনন্দ ছুটে এসে ব'ললে—মা এখন খুব ব্যস্ত। ভরতপুরে চিঠি পত্র লিখছে।...কি দরকার?

ভবতোষ ব'ললে—আচ্ছা, লেখা হ'য়ে গেলেই আস্‌তে বল্‌বি।

আনন্দ ছুটে চ'লে গেল এবং ক্ষণপরেই মেনকার হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে আবার ফিরে এলো।

মেনকা আগন্তুককে দেখেই মনে মনে শিউরে উঠ্‌লো। কিন্তু আপন নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে শঙ্কিত হওয়াটা নিছক পাগ্‌লামি ছাড়া অন্য কিছু নয় ভেবে, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।......যেন দারুণ এক বিভীষিকার কবলে প'ড়ে তার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হ'য়ে গেছে! সে না পারলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে, না পারলে কুশল প্রশ্ন করতে। কাঠের পুতুলটির মতই নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।...এ আগমনের হেতু কি?...

আগন্তুক শান্তিরাম।

মেনকাকে নীরব দেখে, শান্তিরামই কথা কইলে—আপনি বুঝি ভরতপুরটাকে একবারেই পায়ে ঠেলে রাখলেন?

মেনকা কোন রকমে একটুখানি হেসে, দু'চার বার গলা ঝেড়ে আস্তে আস্তে ব'ললে—কাল্‌কেই সেখানে যাচ্ছি।

শান্তিরাম খুব খুসীর ভাব দেখিয়ে ব'ললে—ভরতপুরের এবং তার অধিবাসীদের পরম সৌভাগ্য ব'লতে হবে নিশ্চয়।...তা ভালই হ'ল, চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।

মেনকা ব'ললে—আপনিও কাল যাচ্ছেন? কিন্তু হঠাৎ আমাকে আবার 'আপনি আজ্ঞের' চাবুক মারতে সুরু করলেন যে? আগে তো 'তুমি' ব'ল্‌তেন।

এম্‌নি সময় ভবতোষ হাত মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

শান্তিরাম ব'ললে—সে মুখ তো তুমি আমার রাখোনি মেনকা!... ভরতপুরের বনিয়াদি বংশের ছেলে হ'য়ে, ওর বাড়া অপমান কি আমার ছিল কিছু?

মেনকা মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

শান্তিরাম উষ্ণ হ'য়েই ব'ললে—আজ যদি বাড়ীতে ডেকে এনে, সেদিনকার প্রতিশোধ এখন নিতে, আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হ'তাম না। এ ক'লকাতা সহর। কে-ই বা আমাকে চেনে? কিন্তু আমারই গ্রামের মধ্যে—

কথার মাঝখানেই মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—সেখানে তো অন্য লোক কেউ ছিল না। দারোয়ানটা তো ভোজপুরী। সে-ও আপনাকে বনিয়াদি বংশের ছেলে ব'লে জানে না। তা ছাড়া বনিয়াদি বংশের মত কাজটি তো আপনি করেননি সেদিন। যার জন্যে লজ্জায়, রাগে এবং ভয়ে,

নিতান্ত দুঃখের সহিত আমাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে হ'য়েছিল। ...যাক্ না হয় তার জন্যে আজ দু' হাত যোড় ক'রে, আপনার কাছে মাপ চাইছি।...এখন উঠে আসুন, হাত-মুখ ধুতে হবে না?...যা তো আনন্দ, তোর মামা বাবুকে বাথ্‌ রুমটা দেখিয়ে দিবি।

শান্তিরাম উঠ্‌তে উঠ্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—এই আনন্দটি কে?

মেনকা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিলে—আমার ছেলে যে! আপনি বুঝি জানেন না?

বিস্মিত শান্তিরাম ব'লে উঠ্‌লো—সে কি মেনকা? তোমার ছেলে? কই এ সংবাদ তো আমি জান্‌তাম না।

মেনকা স্মিত মুখে ব'ললে—জিজ্ঞাসা তো করেননি কোনো দিন। হ্যাঁ...ও আমার ছেলে।...আমি ওর মা,—কি বল্ আনন্দ?...ব'লতে ব'ল্‌তে আনন্দর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। তারপর শান্তিরামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ললে—পেটে ধরবার সৌভাগ্য পাইনি, তবু আমি ওর মা-ই।

শান্তিরাম আবার ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো।

মেনকা ব'ললে—কি আবার ব'স্‌লেন যে? যান্!...খেতে হবে না এর পর?...কিন্তু হঠাৎ কি জন্যে ক'লকাতায় আস্‌তে হ'য়েছিল তা তো কই ব'ল্‌লেন না?

শান্তিরাম সুমুখের টেবিলটার ওপর হাতের রিষ্ট ওয়াচ্‌ এবং বুকের ফাউন্‌টেন্ পেনটা খুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে ব'ললে—এক্‌সাইজ্‌ ডিপার্ট-মেণ্টের বড় সাহেবের কাছে দরকার ছিল একটু।

—দরকার মিটে গেছে?

—হ্যাঁ, সামান্য শ পাঁচেক টাকাতেই কাজ হাঁসিল হ'য়ে গেছে। বাঙালী

কেরাণী গুলোকেই টাকা খাওয়াতে হয়, নইলে ওপর-ওলারা—দয়ার অবতার!

ভ্রূ কুঁচ্‌কে, পরিহাসের সুরে মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—আহা! তা আবার নয়! গরীবের মা বাপ!......তাইতো আপনার ওপর দয়া ক'রেছেন। আর কেরাণীর দল সব বাঙালী কিনা!......হতভাগাদের খালি 'খাই খাই'—'দেহি'দেহি', এত খেয়েও পেট ভরে না। এই ক'রে ক'রে নিজের দেশটাকে অবধি পেটে পূরেছে—তবু কোনদিন বদ্‌হজম হচ্ছে না! গালাগাল কি আর সাধ ক'রে মুখ থেকে বেরোয়!...কি বলেন?

শান্তিরাম গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো।

মেনকা ব'ললে—যান্ তা হ'লে, দেরী ক'রে লাভ নেই। পাঁচ পাঁচ শো টাকা গেছে,—তা যাক্, আপনাদের মত লোকের অমন কত দিকেই তো কত টাকা যাচ্ছে। এ না হয় ধরে রাখুন ভিখিরীকে ভিক্ষে দিয়েছেন। বনিয়াদি বংশে দান খয়রাত না থাক্‌লে মানাবে কেন?... তা ছাড়া দেশের গরীব বাঙালীকে দিয়েছেন। কেরাণীর মত হতভাগা কি আর ত্রিসংসারে আছে? ওরা লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব করে, হাজার হাজার টাকা দু'হাতে নাড়াচাড়া করে, কিন্তু মনিবের ঘর থেকে বাইরে এসেই দারোয়ানের কাছে দু' আনা সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। অভিশাপ আর বলে কাকে?...

...অনেক রাত্রিতে আহারাদি শেষ হ'য়ে গেলে, শান্তিরাম মেনকাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাল কোন্ ট্রেণে যাচ্ছো মেনকা? আমি কিন্তু সকালকার গাড়ীতেই যাত্রা করবো।...হাতে বিস্তর কাজ রয়েচে।

মেনকা ব'ললে—হাতের জরুরী কাজ, এ আর আমাদের মিট্‌বে না কোনো দিন। আমারও আপনারই মতন অবস্থা। এখানে এমন

কতকগুলো কাজ জমা হ'য়ে আছে, যা না শেষ করে কোন রকমেই আমার যাওয়া হ'তে পারে না। নইলে দিব্যি গল্প করতে করতে এক-সঙ্গে যাওয়া যেত।...অদৃষ্টে সে সুখ আর মিল্‌লো না দেখ্‌ছি।...আমাকে বাধ্য হ'য়ে রাত্রির গাড়ীতেই যেতে হবে।

শান্তিরাম ঈষৎ হেসে ব'ললে—তার চেয়ে সত্যি কথাটাই বলো না, যে, আমার সঙ্গে যেতে তোমার মত নেই। আমাকে তুমি ঘৃণা করো।

মেনকা লজ্জিত হ'য়ে ব'ললে—প্রথমকার কথাটা আপনার একটুও সত্যি নয়। তবে যদি অপরাধ না নেন্‌ তা'হলে বলি, যে,—দ্বিতীয় কথাটা যা ব'লেছেন, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শান্তিরাম ব'লে উঠ্‌লো—তা-হ'লে সত্যি সত্যিই আমায় তুমি ঘৃণা করো মেনকা ?

মেনকা স্মিত মুখে জবাব দিলে—দেখুন, পাপীকে ঘৃণা করতে হয় না, ঘৃণা করতে হয় তার পাপ কাজটাকেই। আপনাকে আমি একটুও ঘৃণা করি না,—ঘৃণা করি আপনার কৃত কর্ম্মকে।

শান্তিরাম আর মুখ তুলে কথা কইতে পারলে না।

মেনকা ব'ললে—সত্যি সত্যিই সকালে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ,—একসাইজ্‌ ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌স্পেক্টার মশায় খুব শীগ্‌গীর আমার ওখানে যাবেন কিনা। সেই জন্যে একটু খাট্‌তে হবে।

মেনকা 'এক্‌সাইজ্‌' কথাটার মানে জান্‌তো না। এবং বর্ত্তমানে জান্‌বার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করলে না।

মেনকা ভরতপুরে এসে, প্রায় সাত আট দিন পর্য্যন্ত বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দিলে।

রমাই পণ্ডিত স্বয়ং আনন্দর শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শান্তিরাম সেই ক'লকাতায় যা মেনকার সঙ্গে দেখা ক'রেছিল, ভরতপুরে আসার পর এই ক'দিনের মধ্যে একদিনও সে এ বাড়ী-মুখো হয় নি।

মেনকা রোজই গঙ্গাস্নান করতো। দুখানা পাল্কী ছিল, শীতল ব'লতো পাল্কী ক'রে গঙ্গাস্নানে যেয়ো দিদিমণি! যখন তখন হেঁটে যাওয়া তোমার সাজে না।

কিন্তু মেনকা তার উত্তরে ব'ল্তো—ভরতপুরটাকে যে আমারই হাতেগড়া করতে চাই ম্যানেজার বাবু! ওর সঙ্গে আমার সকল রকমের পরিচয় রাখ্তে হবে।

সে দিন স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করে, মেনকা তার বস্‌বার ঘরের আলমারিটা খুলে কতক গুলো পুরোনো খবরের কাগজ বেশ যত্ন করে রেখে দিচ্ছিল, এমনি সময় আনন্দ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ব'ললে—সেই যে ক'লকাতায় গেছলেন—এখানকার শান্তিরামবাবু, তিনি আমাদের বাড়ী এসেচেন মা! তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

মেনকা একটুও আশ্চর্য্য হ'ল না। এবং শান্তিরামের সঙ্গে দেখা করবার জন্য একটা যেমন তেমন ঔৎসুক্যও যে তার মনের মধ্যে আছে, তা-ও বোধগম্য হ'ল না। ব'ললে—আচ্ছা এই ঘরেই তাকে নিয়ে

আয় আনন্দ!...কিন্তু তোর পড়াশুনো কি এরই ভেতর শেষ হ'য়ে গেছে?

—না, আমি তো পড়ছিলাম।

—তবে পড়তে পড়তে উঠে এলি যে? তোকে বলি-নি—পড়বার সময় কোথাও উঠ্‌বি-নি?

—পণ্ডিতদা এখনো আসেন নি যে।

মেনকা ঈষৎ চিন্তিত হ'ল। রমাই পণ্ডিত এতখানি বেলা অবধি কোনোদিনই এখানে না এসে থাকেন না।...শান্তিরাম গৃহ প্রবেশ করতে করতে ব'ললে—নমস্কার রাণীজি!...আমার কসুর মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

মেনকার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সাম্‌লে নিয়ে, বেশ হাসিমুখে ব'ললে—ভরতপুরটা আপনাদের বহুকালের এক চেটে জমিদারী কি না,—তাই এমন ধারা ঠাট্টা করতে পারলেন। তা-ছাড়া আমি কি আর একটা মানুষ!......

শান্তিরাম অপ্রতিত হ'ল। ব'ললে—এ কথার মানে কি মেনকা? তোমাকে আমি ঠাট্টা করলাম?...কিন্তু জ্ঞানে তো কখনো—

মেনকা কাগজের আল্‌মারীটা বেশ ভাল করে বন্ধ করে, একখানা চেয়ার টেনে ব'স্‌তে ব'সতে সুমুখের চেয়ারখানা শান্তিরামকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ললে—বসুন।

তারপর উভয়ের বসা হ'লে, মেনকা ব'ললে— দেখুন পাড়াগাঁয়ে বট্ অশ্বথ গাছের গুঁড়িতে সিঁদুর আর তেল-হলুদ মাখিয়ে মেয়েরা মা-ষষ্ঠীর পূজো করে। পাথরের নুড়িকে কালী-মঙ্গল-চণ্ডী-শিব ইত্যাদি নামকরণ ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেবতা-জ্ঞানে ভোগ পূজো দেয়। কিন্তু যদি কখনো দেব-সেবায় বিঘ্ন আসে, বা মানু-

ষের তরফ থেকে সেবার অপরাধ হয়, পাথর বা বৃক্ষরূপী দেবতা দেবত্ব দেখায় না, সেই পাথর বা গাছ হ'য়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত্যাচার সহ্য করে। সুতরাং সবই মানুষের খেয়াল। একদিন 'দেবতা' ব'লে যে গাছতলায় মাথা খুঁড়ে প্রণাম জানিয়েছিল, কালে সেই গাছটার গুঁড়ি কেটে হয় তো স্বেচ্ছাচারী মানুষ নতুন তৈরী বৈঠকখানা ঘরের টেবিল-চেয়ার বানায়।...আপনাকে মিনতি করছি ঐ 'রাণী' কথাটা ব'লে অপমান করবেন না। ভরতপুরের রাজা হ'য়ে, একটা গরীব প্রজার সঙ্গে এ-হেন উপহাসের যোগাযোগ রাখা কি আপনারই উচিত? কিন্তু যদি অনুমতি দেন, তা-হ'লে আপনাকেই এখন থেকে 'রাজা' কেন 'মহা-রাজা' ব'লে ডাক্‌বো।

শান্তিরাম প্রবল জোরের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—ভগবানের দিব্যি যদি আমার মুখে না শোভা পায়, তা-হ'লে আমার স্বর্গগত পিতার দিব্যি ক'রে ব'লছি মেনকা—

মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—ও দিব্যিটাও হয় তো আপনার মুখে ঠিক মানাবে না শান্তিবাবু! দিব্যি টিব্যির বালাই নিয়ে কাজ কি? আপনি সোজাসুজি যা ব'লবেন বলুন। দিব্যি করা অর্থে—নিজেকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলা।...যাক্ কি ব'লছিলেন বলুন।

শান্তিরাম ব'ললে—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে আমি সেদিন কথায় কথায় ব'লেছিলাম, গভর্ণমেন্ট যাতে তোমাকে রাণী উপাধিতে সম্মানিত করেন। বিশেষতঃ তোমার যখন সম্পূর্ণই দাবী রয়েচে।

সহসা যুক্ত করে মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—ভরতপুর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার এত বড় কৌশল আপনি এর আগে একটিও আবিষ্কার করতে পারেন নি।...আজ বুঝ্‌লাম সত্যিই আপনার বাহাদুরী আছে।

...কিন্তু আপনার, আমি এতদিনের মধ্যে কি কি ক্ষতি ক'রেছি, দয়া ক'রে তার একটা ফর্দ্দ দিতে পারেন?

শান্তিরাম হো হো করে হেসে উঠ্‌লো।

মেনকা জান্‌তো, এই হাসিটাই তার সবচেয়ে সর্ব্বনেশে।

শান্তিরাম ব'ললে—তোমার সঙ্গে রোজই সকাল বেলায় ভাবি আজ দেখা করবো, কিন্তু কাজের জ্বালায় হ'য়ে ওঠে না। আজ বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম—শত কাজ নষ্ট হ'য়ে যায় যাক্, তবু মেনকার কাছে দিন দিন ছোট হ'য়ে যাবো না। কাজ মাটী হয়, হয় তো তা শুধ্‌রে নিতে পারবো। কিন্তু তোমার কাছে অবিশ্বাসী বা জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ প্রতিপন্ন হ'লে—সে দোষের স্খালন নেই। তাই তো ছুটে এসেছি!

মেনকা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। শান্তিরামের কথার সুরটা যেন আবার সেই বকেয়া রাগিণীরই আলাপ করতে চায়। জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নতুন দোকানটা কেমন চ'লছে?

শান্তিরাম হঠাৎ চমকিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে চাইবার আছে মেনকা! যদি দয়া ক'রে দাও—

মেনকা ব'ললে—ভিক্ষে দেওয়ার মত আমার অবস্থাটি কোন্‌খানে দেখ্‌লেন?...কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমার ঐ দোকানটার জন্যে একটা বড় কাউণ্টার আর কতকগুলো বেঞ্চি তৈরী করতে হবে,—

—মাতালগুলো যাতে ব'সে ঢুক্ ঢুক্ ক'রে মদ খাবে আর আপনাকে 'মামা' ব'লে আপ্যায়িত করবে?

—সে তুমি যাই বলো, যখন মদের দোকান প্রাণান্ত চেষ্টার পর পেয়েছি—

—'পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি' বলুন। এই দোকানের জন্যেই সেদিন ক'লকাতায় গেছলেন—তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি।...আমি সেদিন 'এক্‌সাইজ্‌' কথাটার মানেই জান্‌তাম না।...আপনার মহাভাগ্য ছিল ব'লেই তো এ হেন মহা গৌরবময় ভাগ্য এবং করুণা, করুণাময় ভগবানের কাছ থেকে লাভ ক'রে, আপনি এবং আপনার বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা সকলেই ধন্য হ'য়েছেন, কৃতকৃতার্থ হ'য়ে গেছেন।...আমার কিন্তু মহা হিংসে হচ্ছে শান্তি বাবু! বাস্তবিকই তো, কিসের জোরে, কতখানি দাবীতে, কত দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যার ফলে—শুঁড়ী জাতটাই মদের এক চেটে ভেণ্ডার হ'য়ে চিন দিন দোতলা-চারতলা বাড়ী করতে থাক্‌বে? তা ছাড়া দেশ জুড়ে এই অসংখ্য ভাগ্‌নার দল, এরাই বা কেন শুঁড়ী জাতটাকেই খালি 'মাতুল' সম্বোধন ক'রে কৃতার্থ করবে? এখন সভ্যযুগে, বামুন-শুঁড়ী কায়েত-শুঁড়ী হওয়াটা সত্যিই বাঞ্ছনীয়।... তা ছাড়া গরীব দেশের লোকগুলো পরণে পরতে পায় না, পেটে ভাত যোগাতে পারে না, ছেলে-মেয়েদের জন্ম দিয়ে সংসারে এনেও খাওয়াতে পারে না,—তাদের কি কষ্টের সীমা আছে?—সেই সব লোকগুলো মনের দুঃখে দিল্‌ সাচ্চা রাখতে বা দিল্‌দরিয়া মেজাজ হতে, যখন আপনার দোকানে গিয়ে 'মামা' ব'লে ডাক্‌বে, তখন ওপর থেকে ভগবান্‌ তো ভগবান, যদি ভগবানের বাবা-ঠাকুরদা বেঁচে থাকে তো তারাও আপনার মাথা লক্ষ্য করে ঝুরি ঝুরি বস্তা বস্তা আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতে একবারও পেছন ফিরে চাইবে না। উঃ মতলব যা করেছিলেন শান্তি বাবু! আপনাকে আজ হুশো তারিফ্‌ দিচ্ছি। বরং যদি অনুমতি দেন,

তাহ'লে ক'লকাতা থেকে দু'দশজন ভাল গাইয়েকে নেমন্তন্ন করে, আপনাকে একদিন বিরাট একটা অভিনন্দন দিই। আমাদের ভরত-পুরের আর পাশাপাশি গাঁ গুলোর হতভাগারা সত্যিসত্যিই এতকাল হতভাগা ছিল, কেননা, শোক-দুঃখ বুকে দেবে রেখে খালি খালি কেঁদে সারা হ'য়ে যেত।...এ তবু দু' এক বোতল পেটে পড়লে মনটা তাজা থাকবে। ভাত-কাপড়ের কষ্টটা আর কষ্ট ব'লে মনে পড়বে না।... কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করে পৃথিবীর যা উপকার করে গেছেন, —আপনি ভরতপুরে সর্ব্ব প্রথম মদের দোকান খুলে তার লক্ষগুণ বেশী উপকার করলেন।

শান্তিরাম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব'ললে—তোমার অন্যায় ঠাট্টা। আজকাল শিক্ষিত লোক ছাড়া মদের দোকান তো আর কেউ হাতে নিচ্ছে না।

মেনকা দৃপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্লো—না নিলে শিক্ষার জৌলুস বাড়বে কেমন ক'রে? শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা, তার পরিণতি টুকুও সেরকম না হ'লে যে মোটেই মানাবে না শান্তিবাবু! এত বড় গ্রামের মধ্যে প্রাধান্য লাভ, একি যেমন তেমন পুণ্যফলে হয়?...আচ্ছা একটা কথা সত্যি ব'লবেন?

শান্তিরাম টেবিলের ওপর থেকে হাত দুটো তুলে নিয়ে আপন চোখের ওপর রেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ললে—এর মধ্যে মিথ্যে তো একটাও বলিনি। যদি সব কথাই আমার মিথ্যে ব'লে তোমার ধারণা হয়, তাহ'লে না জিজ্ঞেস করাই ভাল।

মেনকা ব'ললে—ভরতপুরে মদের দোকান তো আগে ছিল না, গাঁজার একখানা ছোট খাটো দোকান ছিল বটে। কিন্তু এই নতুন পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রটার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কি আপনিই স্বচেষ্টায় করলেন?

এরই জন্যে বুঝি হতভাগা বাঙালী কেরাণীদের পাঁচ পাঁচশো টাকা ঘুস্ খাওয়াতে হয়েছিল ?

—ভরতপুর জায়গাটা, অবিশ্যি তোমারই কল্যাণে যে রকম দিন দিন উন্নত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাতে বাজারের মধ্যে একখানা মদের দোকান না থাকাটা অত্যন্ত অশোভন ঠেক্‌ছিল। বিদেশী লোকজন এ গাঁয়ে এসে অনেকদিন অনেক রকম নিন্দে করে গেছে। সেই জন্যেই তো আমি উঠে প'ড়ে লেগেছিলাম। আমি জান্‌তাম মেনকা, যে, তুমি আমার একাজে খুবই সন্তুষ্ট হবে। যেহেতু ভরতপুরকে তুমি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালো বাসো।

মেনকা সহসা টেবিল চাপ্‌ড়ে ব'লে উঠ্‌লো—কে ব'ললে আমি সন্তুষ্ট হইনি ? বাক্সের টাকা খরচা ক'রে আপনাকে অভিনন্দন দিতে চাচ্ছি কি অসন্তোষের প্রমাণ দেখাতে ?...আপনি বেজায় কম বোঝেন শান্তিবাবু! তাছাড়া আপনার এই নতুন উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও আমাদের গ্রামবাসীর তরফ্ থেকে একটা সভাসমিতি করে অভিনন্দন দেওয়া অত্যন্ত উচিত। আমি আজই শীতলবাবুকে আর পণ্ডিতদাকে ব'লে আয়োজন করাচ্ছি।...শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, তিনি ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রামবাসীর কাছ থেকে যে নতুন খেতাব লাভ করলেন, তার জন্যে গ্রামবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন দেবে না ?...সব মূর্খের দল কি না। ব্যাপারটা এতদিন কারুর মাথাতেই ঢোকেনি। আচ্ছা, তার আগে আপনি বলুন তো—বেঞ্চি-টেবিল তৈরী করতে কি কি আপনার দরকার ?—আমার কাছে কি চাইছেন ?

—তোমার ঘরে অনেক কাঠ র'য়েচে। বিল্ডিং তৈরীর সময় এসেছিল, তা তো সব কাজে লাগেনি, তাই থেকে কিছু চাইতে এসেছিলাম।...

কিন্তু উপাধি-প্রাপ্তির অভিনন্দন—এ আবার কি নতুন কথা সুরু করলে মেনকা? উপাধি তো গভর্ণমেণ্ট এখনো দেননি। বড়দিনের সময় সে সব হবে।

মেনকা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললে—গভর্ণমেণ্ট তো 'রাজাবাহাদুর' কিম্বা 'জমিদার' অথবা 'ভরতপুর-ভয়হারী' এম্‌নিতর যা হোক্ একটা কিছু দেবেনই...উপস্থিত ভরতপুরের হতভাগারা যে উপাধিটা দিলে—আমি তারই কথা বল্‌ছিলাম।

—সে আবার কি উপাধি?

বিরাট্ অবজ্ঞার সুরে মেনকা ব'লে উঠ্‌লো—কেন মাতালের 'মামা'। যা এ যাবৎকাল শুঁড়ী ছাড়া কারুর পাওনা ছিল না। ব্যাপার কি জানেন শান্তিবাবু! 'এক্ চেটে' কথাটার যে অপমান করতে পারে, আমি তাকেই বলি বাহাদুর।

শান্তিরাম চুপ করে রইলো।

মেনকা সহসা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—আচ্ছা শান্তিবাবু! ভরতপুরকে আপনি এত যে ভালবাসেন, কিন্তু এই শীত পড়ছে, যারা গরীব, তাদের গায়ে দু'চারটে কম্বল কি আর কিছুর ব্যবস্থা করে দেন না কেন?... আজ গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখি—হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে কত লোক কাঁপুচে। আপনার দোকানের টেবিল-চেয়ার না হয় দিনকতক পরেই হবে।

শান্তিরাম বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে—আরে রামঃ! ও সব গরীব ব্যাটারা একদম্ ভণ্ড, নইলে ব্যাটারা মদের পয়সা পায় আর কম্বল কিন্‌বার পয়সা জোটে না?

মেনকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো।

হাসির চোটে শান্তিরাম যেন ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—হাসলে যে বড় ?

—আপনার কি সুন্দর গবেষণা !...বাস্তবিক শিক্ষিত লোক না হ'লে গরীবদের কদর কেউ বোঝে না। ব্যাটারা সব এত ভণ্ড !...বলেন কি শান্তিবাবু !...ব'লতে ব'লতে মেনকা যেন জোর করে অনেকখানি হেসে নিলে।

শান্তিরাম ব'ললে—আমি উঠি তাহ'লে। নাওয়া-খাওয়া শেষ করতেই দশটা বেজে যাবে।...দোকানে যাওয়া আর আফিসে যাওয়ায় এতটুকু তফাৎ নেই কি না। বন্ধ করবার বেলাতেও তেমনি। একশো টাকার খদ্দের মাথা খুঁড়ে ম'রে গেলেও, আমার দেওয়ার আইন নেই।

গম্ভীর হ'য়ে মেনকা ব'ললে—আচ্ছা আপনি নিজের হাতেই বিক্রী করেন তো ? বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ?

—লোক না থাকলে তা-ও মাঝে মাঝে করতে হয় বই কি।

—তখনই বুঝি চারধার থেকে "মামা এক টাকার, ও মামা চার আনার, ওগো মামা আট আনার" এইসব চীৎকার ওঠে ?

—"তা ওঠে বইকি" ব'লেই শান্তিরাম মাথা হেঁট করলে।

মেনকা হাসতে হাসতে ব'ললে—আর আপনি বেচতে বেচতেই আপনার লোক এসে পড়লে, তখন উঠে এসে গদীতে বসেন তো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, শুনিচি মদ খেয়ে মানুষ মাতাল হয়, আর মাতালদের কাণ্ডজ্ঞান অনেক সময় লোপ পেয়ে যায় ; তা আপনারই দোকানে ব'সে মদ খেতে খেতে, মাতালগুলো আপনাকেও বিচ্ছিরি গালিগালাজ করে তো ?

—সময় সময় করে বই কি। তখন কি আর তারা মানুষ থাকে? পাগল হ'য়ে যায়।

—তখন আপনিই বুঝি পাগল তৈরীর কারখানাটার একচ্ছত্র সম্রাট্ হ'য়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসেন?...দেখুন দোষ শান্তিবাবু! মূর্খ শুঁড়ীর কি এসব কাজ?...শিক্ষিত শুঁড়ী না হ'লে এত সব গালাগাল বেমালুম হজম করতে পারে কখনো? নইলে দোকানে ব'সেই হয়-তো বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি সুরু হ'ত। নাঃ আপনি এ গাঁয়ে সত্যিই নতুন যুগের প্রবর্ত্তন করলেন। এখন আমাদের এই নবযুগ-প্রবর্ত্তককে শ্রীভগবান যদি অনুকম্পা ক'রে চিরজীবী ক'রে রাখেন তবেই।...বা—বা কি তোফা সৎকার্য্যটা মাথা ঘামিয়ে বাছাই ক'রে বার করেছেন শান্তিবাবু!...আপনাকে দুশো নমস্কার।

শান্তিরাম মনে মনে অতিশয় অশান্তি ভোগ করছিল। মেনকার সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তুল্য কথাগুলো যেন তার মনের প্রতি পরতে পরতে এক একটা শোণিত-রেখার সৃষ্টি ক'রে দি'য়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে তখন-কার মতই হয়তো।

শান্তিরাম ব'ললে—কাঠ দেবে তো?

মেনকা গম্ভীর মুখে জবাব দিলে—অন্যকাজে, যা আছে সব দিতে পারি, কিন্তু মদের দোকানের জন্যে একখানাও দিতে পারবো না। এই অক্ষমতার জন্য আজ করযোড়ে মার্জ্জনা চাই শান্তিবাবু!

শান্তিরামের মুখখানা আষাঢ়-আকাশের মতই আঁধার হ'য়ে এলো।

হপ্তাখানেক পরে, একদিন প্রাতঃকালে মেনকা রমাই পণ্ডিতকে ব'ললে—আপনার পাঠশালে ছাত্র-সংখ্যা কত পণ্ডিতদা ?

রমাই পণ্ডিত ব'ললেন—ছাত্রসংখ্যা দিন দিন কম হ'য়ে আসচে দিদি। মাসখানেক পরে হয় তো পাঠশালা তুলে দিতে হবে। এখন মাত্র পঞ্চাশ জন ছাত্র, তাও নিয়মিত হাজির হয় না, জন ত্রিশ ক'রে হাজির থাকে।

—আর ছাত্রী কত আছে ?

—এগারো কি বারো হবে।

—ছাত্র সংখ্যা ক'মে যাচ্ছে কেন ?

—গ্রামে নতুন যাত্রা পার্টি হ'চ্ছে। অনেক ছেলে পার্টির কলে মগজ বাড়িয়ে দিয়ে, মগজের ঘিটুকু গলিয়ে নিচ্ছে। সম্ভবতঃ তাদের অভিভাবকরাই একদিন সে ঘি ভোজন করবেন। কেউ সাজ্‌বেন রাখালবালক, কেউ হবেন—শ্রীরাধা, কেউ বা মদন-রতি,—

মেনকা চিন্তিত হ'ল। খানিকক্ষণ ভেবে ব'ললে—তাতে ক্ষতি কি ? পাঠশালার পড়াশুনো শেষ করেও তো এসব আমোদ চ'ল্‌তে পারে।

—তা হয় তো পারে। কিন্তু মনের ইচ্ছা যদি বেঁকে দাঁড়ায়, তাহ'লে তো কোন কাজই হ'য়ে ওঠে না দিদি ! তার ওপর সুকুমারমতি শিশুর দল, তারা আগুন দেখ্‌লেও খেলার জিনিষ ভাবে। ভাল রেখে মন্দতে এগিয়ে যাওয়াটা তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক বেশী। বুড়োর সঙ্গে

একাসনে ব'সে তামাক-বিড়ি খাওয়া, এক সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি ইয়ারকি করা —এ সব তাদের ভালই লাগে কি না। কাজেই যাত্রার পার্ট মুখস্থ করতে যত উৎসাহ আসে, পাঠশালের চাণক্য শ্লোক পরতে তার সিকিও আসে না।

—আপনি কেন তাদের শাসন করেন না?

—অভিভাবকদের তা ইচ্ছা নয়। যার বাপ অর্জ্জুন সাজে,—তারই ছেলে হয় তো রাখাল-বালক সাজ্‌বে। বড় দাদা অভিমন্যু। ছোট ভাই হয় তো উত্তরা।...শাসন করবে কে?

মেনকা গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিল।

রমাই পণ্ডিত ব'ললেন—ভেবে আর কিছু হবে না ভাই! ভরত-পুরের লোক তোমার মত্‌টাকে ঠিক ভাবে নিতে পারলে না।

ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে মেনকা ব'ললে—আপনি কি সব ছেড়ে দিয়ে আমাকে পালাতে বলেন পণ্ডিত দাদা?

রমাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

মেনকা বললে—এক কাজ করুন, আজ পাঠশালে গিয়ে জন-কতক বড় বড় ছেলেকে মদের দোকানে পাঠিয়ে দেবেন।

রমাই পণ্ডিত হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন।

মেনকা ব'ললে—মদ খেতে মদের দোকানে যাবে না তারা। যাবে যারা মদ খায়, গাঁজা খায় তাদের চিনে আস্‌তে।

—তা কি হয় দিদি? মাতাল কি কথনো মদ ছাড়ে?

—আমি তাদের খেতে দেব, একটাকার মদের বদলে দু টাকার সন্দেশ খাওয়াবো। দরকার হয় তো বাইরে থেকে লোক আমুন। তারাও যেন মাতাল বা অন্য নেশাখোরদের বাড়ীতে গিয়ে

উপদেশ দেয়। নেশা করার পরিণামটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে।

রুক্মিণী পণ্ডিত ভাব্‌তে ভাব্‌তে চ'লে গেলেন।

মেনকা ডাক্‌লে—আনন্দ!

আনন্দ কাছে আস্‌তেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় তার গাল দুটো রাঙা ক'রে দিলে। তারপর তাকে কোলে বসিয়ে ব'ললে—তুই পারবি আনন্দ? মদের দোকানে, গাঁজার দোকানে গিয়ে, যারা মদ-গাঁজা খায়, তাদের হাতে-পায়ে ধ'রে বাড়ীতে ডেকে এনে, নিষেধ করতে পারবি? বল্‌বি যে, ভাই সকল, এ বিষ খেলে সর্ব্বনাশ হয়, মানুষ আর মানুষ থাকে না। এই সব ব'লে সকলকে ভুলিয়ে নেশার হাত থেকে ফেরাতে পারবি?

আনন্দ আনন্দের আধিক্যে লাফিয়ে উঠ্‌লো। ব'ললে—পারবো মা! ও আমি খুব পারবো। কিন্তু বড় বড় দু'চারজন থাক্‌লে ভাল হ'ত।...গঙ্গার ধারে আরো এক মজা হ'য়েচে মা! তুমি বুঝি শোনো নি?

মেনকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

আনন্দ ব'ললে—একটা সন্ন্যাসী এসেচে। শিঙে বাজিয়ে ভিক্ষে করে, আর কুকুর নিয়ে খেলা করে। তার কাজই হচ্ছে গান গাওয়া আর কুকুর নাচানো। গান যা করে মা!...যদি বলো তো একদিন আমাদের বাড়ীতে তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

—তুই তাকে কবে দেখ্‌লি?

—কাল বিকেলে দেখেছি, ভিক্ষে করে শিঙে বাজাতে বাজাতে ফিরে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল একপাল কুকুর আর একপাল ছেলে। ভা-রি

সুন্দর দেখ্‌তে কিন্তু,—ইয়া ইয়া দাড়ী, ইয়া বড় বড় জটা, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে র'য়েচে। খুব ফর্সা রঙ, তাতে আবার ছাই মেখেচে। আন্‌বো মা একদিন ডেকে?

মেনকা ব'ললে—এখন থাক্। ভিখিরী যখন, তখন আপনিই আস্‌বে।

তাড়াতাড়ি আনন্দ ব'ললে—আসেই তো। ব্রহ্মচারী-বাড়ী থেকে ভিক্ষে নিয়ে চ'লে যায়। না করে গান, না একটুখানি বসে।...কিন্তু আমি একদিন ওর ওখানে বেড়াতে যাবো মা? যাবো? যাবো মা? ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে ক'রে—

—আচ্ছা যাস্। কিন্তু নাইবার বেলা হ'য়ে উঠ্‌লো যে! ইস্কুল যেতে হবে না?

নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে আনন্দ নাইবার জন্য চ'লে গেল।

...বিকেল বেলায় রমাই পণ্ডিত এসে সংবাদ দিলেন—মাতালদের উপদেশ দেওয়ার জন্যে ছাত্র না পাঠিয়ে অন্য চার পাঁচজনকে পাঠিয়েছিলাম দিদি।

—তারপর?

—দু একজন লজ্জায় দোকান মুখো হ'তে পারেনি। কিন্তু শান্তিবাবু শাসিয়েছে—কাল যদি তোরা আমার খদ্দেরের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াবি, তা হ'লে হাড়-গোড় ভেঙে খোঁড়া করে গাঁ থেকে তাড়াবো।...

মেনকা একটুখানি হাস্‌লে।

রমাই ব'ললেন—কাল যারা যাবে, তাদের হাতে গোটা কতক টাকা দিয়ো দিদি! টাকার লোভেও মাতালরা নেশা ছাড়ে বোধ হয়। তাছাড়া ওদের জন্যেও কিছু কিছু দৈনিক বরাদ্দ না করলে চ'লবে না। বিনা স্বার্থে ওসব কাজ করবার লোক সহজে ভরতপুর থেকে মিল্‌বে না।

মেনকা ব'ললে—যা লাগে আমায় ব'লবেন। সে তো বটেই পণ্ডিত দাদা!...যারা কাজ করবে, তাদেরও তো ঘর-সংসার আছে। কিন্তু তাদের ব'লে দেবেন—শান্তিবাবুর সঙ্গে যেন লড়াই না বাধায়। মার খেতে হবে, কিন্তু মার্‌লে চল্‌বে না। পাড়াগাঁয়ের লোক সাধারণতঃ ভীরু হয়। এখনো তো কাজের সুফল তারা ঠিক বুঝ্‌বে না কিনা।...

...অনেকখানি রাত্রে, রমাই পণ্ডিত বাড়ী চলে গেলে, মেনকা ভবতোষকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিশদ বর্ণনা করে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখছিল।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হ'ল, এবং পরক্ষণেই—আনন্দ কোথায় রে? মেনকা! ব'লে সাড়া দিতে দিতে শান্তিরাম ঘরে ঢুক্‌লো।

স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করে মেনকা শান্তিরামকে বস্‌বার আসন দেখিয়ে দিয়ে ব'ললে—আস্‌তে এত রাত হ'ল যে?...আমি কিন্তু আশা করছিলাম—আপনি সন্ধ্যে বেলাতেই আস্‌বেন।

বিস্মিত শান্তিরাম আসন গ্রহণ করে ব'ললে—আজকাল কি জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে মাজাঘষা করছো মেনকা?—আমি যে আস্‌বো তা তুমি নিশ্চয়ই জান্‌তে?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই জান্‌তাম। কিন্তু সব কথা বল্‌বার আগেই, আপনার মুখটা আমি বন্ধ করে দিতে চাই। দোকান ছেড়ে দিন, আমার সানুনয় ভিক্ষা।

শান্তিরামের উচ্চ হাসিতে ঘরখানা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

মেনকার সপ্রতিভ ভাবটুকু এই বিকট হাসির তরঙ্গে প'ড়ে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়লো। আপনা থেকেই তার মাথাটা লজ্জায় নমিত হ'য়ে গেল। কোন কথাই এক্ষেত্রে বলা সে সঙ্গত বিবেচনা করলে না।

শান্তিরাম ব'ললে—এ কথা ছাড়া আর তো কিছু বল্‌বার নেই মেনকা ?

মেনকা গম্ভীর হ'য়ে মাথা নাড়লে। তারপর সামান্যক্ষণ নীরব থেকে, ব'ললে—কথাটা কি খুব অসঙ্গত বলা হ'য়েচে ? হেসেই উড়িয়ে দিলেন যে ?

—হাসির কথা যখন, কান্না তখন আসবে কেন মীনু ? যার যোগাড় করতে আমায় দেনা করে পাঁচ পাঁচশো টাকা ব্যয় করতে হ'ল,—তা হঠাৎ এক কথায় ছাড়ি কেমন করে ? ব্যবসাপত্র-টাকাকড়ি নিয়ে কথা, যেমন তেমন ব্যাপার তো নয়।

মেনকা একটুও চিন্তা না করে ব'ললে—পাঁচ পাঁচশো টাকা না হয় আমিই আপনাকে আপাততঃ দিচ্ছি। দেনাটা শোধ করে ফেলুন। যাতে সাধারণের অহিত হয়, সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি হ'য়ে, তা করা কি সাজে, না তাই কর্ত্তব্য ? দেশের লোকগুলো যে উচ্ছন্নে যেতে ব'সেচে।

প্রবল অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করে শান্তিরাম ব'ললে—ব্যাটারা সব উচ্ছন্নেই যাক্ মেনকা ! কিন্তু যাবেই বা কেন ?...আমি তো দু'হাত যোড় করে কোনো দিন তাদের বল্‌তে যাচ্ছিনা যে, ব্যাটারা সব আয়, দু এক গ্লাস খেয়ে যা !...নিজের পয়সায় খাবে, ফূর্ত্তি করবে, উচ্ছন্নে যেতে হয় তা-ও যাবে, তাতে তোমার-আমার কি ?

মেনকা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—দেখুন শান্তিবাবু ! এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা বহু কথা ক'য়েছেন, বহু শ্রম তাঁরা স্বীকার করেছেন, এখনো করছেন। সুতরাং তর্ক করতে আমি চাই না। বিশেষতঃ সামান্য মেয়ে মানুষ আমি, আপনার মত লোকের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধটা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়। আগেই ব'লেছি—এ

আমার সানুনয় ভিক্ষা। আপনাকে দিতেই হবে।...আর্থিক ক্ষতিটা তুলেছেন ব'লেই আমি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে তা পূরণ করতে চেয়েছিলাম।...আমাদের দেশ, আমরাই দেশবাসীর মাথা; সুতরাং অজ্ঞানধারা, তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার ভার আমরা না নিলে আর কেউ তা নেবে না, নিতে পারবে না।

শান্তিরামও গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—তোমার কথাটা আমি যদি না শুনি? অর্থাৎ আমার যা স্বার্থ, তাই নিয়েই যদি আমি থাকি,—তা হ'লে?

—কি তা হ'লে?

—তা হ'লে তুমি করবে কি?

—করবার ক্ষমতা যদি কিছু থাকে, অবশ্যই তা প্রয়োগ করবো। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝে নেব যে—দেশবাসীর দুর্ভাগ্য অসীম।

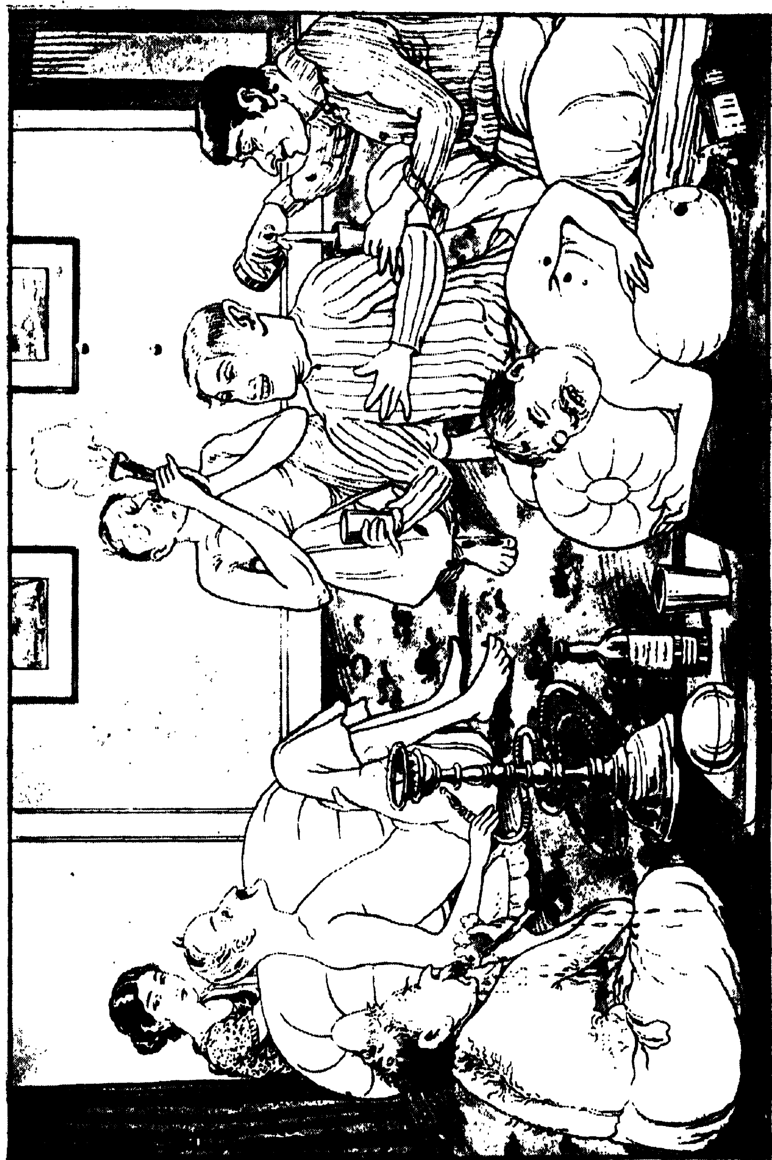
—তার মানে?

—মানে বুঝিয়ে দিতে আমি পারি না, সে কথা তো একটু আগেই ব'ললাম আপনাকে।

—কিন্তু কাল থেকে ওসব ছোটলোক ব্যাটাদের বারণ করে দিয়ো মেনকা!...এ গাঁয়ের জমিদার আমি, পাড়ায় পাড়ায়, যেখানে সেখানে গোলমাল করলে—আমি কারুকে আস্ত রাখবো না।

মেনকা উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললে—দেখুন আপনি জমিদার, রাজা বিশেষ, কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করলে, সহজে কেউ বরদাস্ত করতে পারবে না।...'ছোটলোক ব্যাটা'—ব'লছেন আপনি কাদের?—তারা সব আপনারই মত ভদ্র-সন্তান।

শান্তিরাম অবিচলিত হ'য়ে উচ্চারণ করলে—এক ব্যাটার ছেলেও নয়।



মেনকার মুখ-চোখ ক্রোধে রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো। স্থিরদৃষ্টিতে সে শান্তিরামের মুখপানে চাইলে।

শান্তিরাম সে দৃষ্টির তেজ সইতে পারলে না, মাথা নামিয়ে ফেল্‌লো।

মেনকা ব'ললে—যদি বলি আমারও ছেলে সে দলের মধ্যে আছে?

শান্তিরাম ব'ললে—আমি এখনো অন্ধ হইনি মেনকা, আমার চোখ আছে, তাদের মধ্যে আনন্দকে আমি দেখিনি।

—"কিন্তু কাল সকালেই পাড়ার মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখ্‌তে পাবেন।" ব'লে মেনকা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ক্ষণপরেই সে আবার ফিরে এসে দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললে—দোকান সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করবেন না তো?

শান্তিরাম হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো—করতে পারি, কিন্তু সর্ত্ত আছে। যদি রাজী হও—

মেনকা এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্‌লে—রাজী আমি! এক্ষুনি রাজী! বলুন কি চান আপনি?

—কিন্তু মনে থাকে যেন—দিতে স্বীকৃত।

—হ্যাঁ খুব মনে থাক্‌বে। দেশের ও দশের হিতার্থে আমার সে ক্ষতি একটুও গায়ে লাগ্‌বে না। বলুন কি চান?

শান্তিরাম একখানা হাতে সহসা মেনকার একখানা হাত ধ'রে ব'লে উঠ্‌লো—আমি তোমাকেই চাই মেনকা! তুমি আজ থেকে আমার হও। তোমার আজ্ঞা অবনত শিরে সর্ব্বদাই আমি পালন করবো।

সারা বিশ্বের বুক থেকে বীভৎস এক ভয়াল আর্ত্তনাদ উঠ্‌ছিল। আকাশ ধূম্রবর্ণ হ'য়ে গেছে!...অদূর বনানির উচ্চ শীর্ষে যেন বাড়বানলের

শিখা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌চে! পেচকের আর্ত্তনাদে লক্ষ শয়তানের রূঢ় চীৎকার!

মেনকা কঠোর ভাবটা মনের মধ্যেই দেবে রাখ্‌লে। ধীরে ধীরে আপন হাতখানা ছিনিয়ে নিয়ে ব'ললে—আপনি অবুঝ হবেন না শান্তি বাবু! আমার ছেলে র'য়েছে,—স্বামী নিরুদ্দেশ, তবু তাঁর মূর্ত্তি আমার বুকে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।...হতভাগ্য দেশবাসীর মুখ তাকিয়ে এত কাণ্ডের পরও আপনার সঙ্গে আমি রূঢ় ব্যবহার করতে রাজী নই। এ ছাড়া অন্য সর্ত্ত যদি আপনার না থাকে, তা হ'লে নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাচ্ছি—রাত্রি গভীর, আমার বিশ্রামের সময় হ'য়ে এসেচে তবু খাওয়া হয়নি।

শান্তিরাম আসন ছেড়ে না উঠেই ব'ললে—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ তো?

মেনকা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব'ললে—আমার ভদ্রতা আমি পালন করলাম, আপনার ভদ্রতা আপনার কাছে।

শান্তিরাম উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে—বেশ, চল্‌লাম তা হ'লে। কিন্তু স্মরণ রেখো—খদ্দের ভাঙাবার জন্যে তাদের বাড়ী বাড়ী যদি কেউ যায়, আমি খুন করবো।

গম্ভীর হ'য়ে মেনকা ব'ললে—খুন হবার সাহস যাদের আছে, আমি সেই সব বাছাই করা লোকই পাঠাবো শান্তি বাবু!...আপনার লাঠি ভেঙে আপনারই বুকে বাজ্‌বে, তবু তাদের আত্মা মৃত্যুর পরও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবে না। অমরত্ব পাবার ভরসা না পেলে কেউ মরবার জন্যে কি সাধ করে এগিয়ে যায় শান্তি বাবু?...আচ্ছা তা হ'লে নমস্কার!

শান্তিরাম ব'ললে—কিন্তু এখনো বুঝে দেখ মেনকা!...নইলে—

—"নইলে কি? কি করবেন আপনি?" একান্ত উত্তেজিত ভাবে মেনকা ফিরে দাঁড়ালো।

শান্তিরাম হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ব'ললে—ভরতপুরের অলিতে গলিতে আমি মদের স্রোত বইয়ে দেব।

মেনকা নিতান্ত ঘৃণার সহিত চেয়ে, জবাব দিলে—মেনকার বাঁধ দেওয়ার মত শক্তি আছে জমিদার সাহেব!...ব'লেই আর সে মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা করলো না। যাবার সময় আর একবার হাত তুলে শান্তিরামকে নমস্কার জানিয়ে চ'লে গেল।

ঘনায়মান তুফানের গর্জ্জন সারা কক্ষের মাঝে ভীষণ হ'য়ে সাড়া দিয়েছে। উজ্জ্বল আলোর এলায়িত বুকের মাঝে, অতর্কিতে একরাশ আঁধার ছুটকে এসে সমস্ত ঘরখানাকে আঁধারপুরীর সীমানাভুক্ত করে দিলে!...ঝড়ের মাঝে মন-তরীর অভিযান, দণ্ডে দণ্ডে পল-বিপলে আশঙ্কা—সব ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাবে। দেহের কোন্ সূক্ষ্ম অংশের মধ্যে মহাপ্রাণীটুকু এক কণা জলবিন্দুর আশায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লেও বুঝি করুণাময়ীর অভয় হাত প্রসারিত হ'য়ে এগিয়ে আস্‌বে না!...শান্তিরামের চোখ্ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল যেন!......

———

ঠিক যেন তপোবন।

চারধারে মাধবীলতার বেড়া দেওয়া নিবিড় এক কুঞ্জের মাঝে রঘুনাথ গোস্বামীর আশ্রম। সাধকদের পঞ্চমুণ্ডির আসনের অনুকরণে, রঘুনাথ নিকটবর্ত্তী শ্মশান থেকে গণ্ডাকতক শুক্‌নো মড়ার মাথা নিয়ে এসে তার আসনের নীচে এবং চতুঃপার্শ্বে সাজিয়ে রেখেছিল। সুমুখে চিম্‌টা-কমণ্ডলু এবং ধূমায়মান্ অগ্নিকুণ্ড, তার পাশেই ছোট বড় তিনচারটি গাঁজার কল্‌কে, মধুকরের মত ভক্তবৃন্দ, গুঞ্জনধ্বনিরূপ 'ব্যোম ব্যোম' শব্দে সততই আশ্রম মুখরিত করে আর ধূমে তপোবনের তরুলতা, উৎসব-মন্দিরের লতাপুষ্পের মতই অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

প্রাতঃকাল। প্রভাত সূর্য্যের সোনালি আভা তপোবনের তরুশীরে নবলীলার জয়-নিশান উড়িয়ে দিচ্ছিল। বাতাসের মৃদু পরশে সদ্যস্নাত রঘুনাথের তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ জনৈক ভক্তের শুভাগমন হ'ল। সঙ্গে তার সাত আটটি বালক এবং কিশোর।

রঘুনাথ চোখ মেলে চাইলে, তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে বেলগাছে টাঙানো গৈরিক রঞ্জিত ঝুলিটী দেখিয়ে দিয়েই, চোখ মুদে গুন্ গুন্ করে সুর ধরলে—

আমি তোর আসামী নইরে শমন,
মিছে কেন কর ভাবনা.........

...ভোগ তৈরী হ'ল। রঘুনাথ শ্রীমহাদেব স্মরণপূর্ব্বক শ্রীভোগ

প্রসাদ করে দিয়ে, ভক্তপ্রবরের হাতে দিলে, এবং পরক্ষণেই গান ধরলে—

আমায় যা দিয়েছিলি,
সব কেড়ে নিলি,
ঈশানী পাষাণ-নন্দিনী......

বালকবৃন্দের মধ্যে তখন ক'ল্‌কে নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু হ'য়ে গেছে। রঘুনাথ দেখে একটু হাস্‌লে। বিস্মিত হ'ল না। যেহেতু এ ব্যাপার তার চোখে আজ নতুন হয়। তার শুভাগমনের পর থেকে ক্ষুদ্র এই ভরতপুর ও তার আশপাশের গ্রামগুলি থেকে বালক-বৃদ্ধ-যুবা কতই যে, রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হ'য়েচে,—তার সীমাসংখ্যা করতে হ'লে আজ এই স্নিগ্ধ প্রভাতের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, খড়ি পেতে গণনা সুরু করতে হয়।

বালকরা সাধ্যমত যে যেমন পারলে মহাদেবের প্রসাদ টেনে চোখ রাঙা করে নিঝুমের মত ব'সে পড়লো।

রঘুনাথ ব'ললে—গা না রে ব্যাটারা, সেই নতুন গানখানা সুরু কর্ না! যেখানা কাল সন্ধ্যেয় শিখিয়ে দিলাম—

তারা কোন্ অপরাধে
এ দীর্ঘ মিয়াদে
সংসার গারদে থাকি মা বল্!...

—"গোঁসাইজী আজকে আমাদের বাড়ীতে যাবে? আমার মা ডেকেছেন। অনেক ভিক্ষে দেব।"

সবাই চেয়ে দেখ্‌লে—প্রিয় দর্শন কিশোর—আনন্দজীবন। আনন্দকে এ গ্রামের কারুর চিন্‌তে বাকী ছিল না।

রঘুনাথ স্মিতমুখে বালকের পানে চেয়ে ব'ললে—তোমাদের বাড়ী তো আমি দেখিনি বাবা! কোন্ পাড়ায়, এই গাঁয়ে তো?

আনন্দ হেসে লুটোপুটি। ব'ললে—তুমি তো বেশ গোঁসাই, রোজ রোজ আমাদের বাড়ী যাও অথচ আমাকে ব'ললে—আমি কোন্ গাঁয়ের?...ও কিরে লাদ্‌রা!...তুই গাঁজা খাচ্ছিস্?...দাঁড়া পণ্ডিত দাদাকে ব'লে দেব আজ। এমন মার খাওয়াবো—

বালকদের একজন অর্থাৎ যে লাদ্‌রা, সেই-ই ব'ললে—আজ থেকে পাঠশালেই যাবো না আর। ব'লে আমার কচু করবি।...মাষ্টার মশায় আমাকে আজ একটা নতুন নাচ আর গান শিখিয়ে দেবে।

—কোন্ মাষ্টার?

—"কেন আমাদের অপেরা-পার্টির মাষ্টার মশায়।...কি গান শুন্‌বি?"—বলে লাদরচাঁদ সহসা উঠে দাঁড়িয়ে, হেলেদুলে হাতে তালি দিতে দিতে গান সুরু করলে—

নাচে কালা রঙ্গে
রাখালের সঙ্গে
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে বাঁশরী বাজায়।

আনন্দ তো অবাক্!...ভা-রি আনন্দ হ'ল তার। ব'ললে—আচ্ছা ব'ল্‌বো না কারুকে।...কিন্তু গানখানা আমায় লিখে দিবি ভাই?...ভারি মিষ্টি গান।

লাদ্‌রা ব'ললে—ও বেলায় আমাদের রিয়েসাল্ ঘরে যাস্, মাষ্টার মশায়ের কাছে গাইবো, তখন শিখিস্।...

স্থল-কমলের বুকে ভ্রমর ব'সেছিল,—শোভামুগ্ধ হ'য়ে কমল

তুল্‌তেই হাতে বিঁধ্‌লো—ভ্রমরের হুল্‌...কিন্তু সে তুল্‌বার আগে নয়—পরে। যাতনার জন্য গোড়া থেকেই ভাবনা এলো না।

আনন্দ ব'ল্‌লে—নিশ্চয় যাবো। আচ্ছা এ গান কে বেঁধেচে?

লাদ্‌রা পরম বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে ব'ললে—সে মহা একজন পণ্ডিত লোক। রমাই পণ্ডিতকে টিকি ধরে নাচাতে পারে।...বাবা যার তার গান নয়, চিত্রাঙ্গদা পালার কালাচাঁদের গান। ব'লেই সুর ধর্‌লে—

ভালো বেসে ডাক্‌লে পরে
তারি বাঁধা রই।

দু'লাইন গেয়েই রুষ্টভাবে আনন্দর পানে তাকিয়ে লাদ্‌রা ব'ললে—হ্যাঁরে আনন্দ! তুই গোঁসাইজিকে পেন্নাম করলিনি? ভা-রি তো বিদ্যে শেখা হচ্ছে। পেন্নাম কর,—মহাপ্রসাদ খা।

আনন্দ ভ্যাবাচ্যাকার মত চেয়ে চেয়ে ধপ্‌ করে মাথাটা রঘুনাথের পায়ের তলায় ঠুকে দিয়েই, আবার সোজা হ'য়ে ব'সে ব'ললে—মহাপ্রসাদ কই?

ক্ষুদ্র ভক্ত লাদরচাঁদ জনৈক বৃহৎ ভক্তের মুঠো থেকে গাঁজার ক'ল্‌কেটা কেড়ে নিয়ে, আনন্দর হাতে দিলে। তারপর কেমন করে টান্‌তে হয়, তার কায়দাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম ভাবে আনন্দকে শিখাতে লাগ্‌লো, কিন্তু আনন্দ কোনো রকমেই তা শিখ্‌তে পারলে না। তা ছাড়া ক্রমাগতই সে আপত্তি করে জানাচ্ছিল—গাঁজা খাওয়া মহাপাপ, এ তোরা আমায় দিস্‌নি লাদ্‌রা! মা আমাকে আস্ত রাখ্‌বেন না। মদ গাঁজা খেয়ে খেয়েই তো আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।...মা কত করে সকলকে

নিষেধ করেন।...অথচ গান শিখ্‌বার দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন ত্যাগ করতে না পেরে, সে ক'ল্‌কেটা হাত ছাড়া করতেও দ্বিধা করছিল।

অবশেষে রঘুনাথ স্বয়ং আপন হাতের মুঠোয় ক'ল্‌কেটা ধরে, আনন্দকে কোলের কাছে বসিয়ে নিয়ে বললে—বাবা ভোলানাথের প্রসাদ ব্যাটা! খেলে লক্ষ বছর বাঁচ্‌বি।...

আনন্দ দুহাত পিছিয়ে এসে ব'ললে—না ও আমি কিছুতেই খাবো না।

লাদ্‌রা ব'ললে—খা রে খা। গোঁসাই বাবার হুকুম।...তা ছাড়া নতুন নতুন গান শিখ্‌তে হ'লে ওটা খেতে হয়। আমাদের রিয়েসালে বাবা—তামাক না হ'লে চলে না।......বাদ্‌লা! আদ্‌মা!—ফড়িং!—ধরতোরে সেই গানখানা,—

—মোরা তরঙ্গবালা
পরি তরঙ্গমালা,—

রঘুনাথ তখন অমোঘ সম্মোহন অস্ত্রের সাহায্যে গাঁজার ক'ল্‌কেটা আনন্দর মুখের কাছে ধ'রে, ব'লছে—টান্‌ ব্যাটা! জোরে জোরে টান্‌ দে!...লক্ষ বছর বাঁচ্‌বি। আমি আশীর্ব্বাদ করছি।

আনন্দ অনিচ্ছা-ইচ্ছার মাঝামাঝি অবস্থায়,......টান্‌লে সে, এবং অল্পক্ষণ পরেই ঢ'লে মাটীতে শুয়ে পড়লো।

লাদ্‌রা ব'ললে—ফড়িংটার প্রথমদিনে এইরকম হ'য়েছিল, না গোঁসাই-বাবা? আমার কিন্তু একটুও হয়নি—

নাচে কালা রঙ্গে রাখালের সঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে......

* * * * *

বেলা প্রায় এগারোটার আমলে জনদুই পাইক্‌ রঘুনাথের আশ্রমে এসে দেখ্‌লে, আনন্দ তপোবনের স্নিগ্ধছায়া তলে ঘুমে অচেতন!

রঘুনাথ কিন্তু তখনও আনন্দর সম্যক্ পরিচয় জান্‌তে পারেনি, অর্থাৎ জান্‌বার কৌতূহলটা সে আনন্দকে দীক্ষিত করতে গিয়ে দমন করে রেখেছিল। পাইক্‌দের দেখে, ঈষৎ শঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—ছেলেটি কে?

—আজ্ঞে আমাদের খোকারাজা।......

বিস্মিত ও ভীত রঘুনাথ ব'ললে—খোকারাজা!...রাণীজির ছেলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবা!

সহসা রঘুনাথ আনন্দর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—শতং জীব।......বেশ ছেলেটি, বেঁচে থাক্!...ভা-রি ভালো ছেলে। আমার গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ব'লেই চট্ করে পাশ থেকে শিঙ্গটা তুলে নিয়ে জোরে এক ফুঁ দিলে—ভোঁ—ও...

আনন্দ চোখ্ মেলে চাইলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ্ বুজে প'ড়ে রইলো। তখনও রঘুনাথ বাজাচ্ছে—ভোঁ—ও—ও—

পাইকদ্বয় আনন্দকে তুলে নিয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—সুমুখে রমাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা।

রমাই জিজ্ঞাসা করলেন—ঘুমুচ্ছিল না কি?

—আজ্ঞে তাইতো দেখ্‌লাম। গোঁসাই বাবার গান শুনে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন।

পাশ কাটিয়ে ভয়ে ভয়ে লাদরচাঁদ-আদমচাঁদ-ফড়িংচরণের প্রস্থান,—সহসা পণ্ডিতমশায়ের দৃষ্টি পথে পড়তেই সকলের ভয়ে মুখ নামিয়ে দাঁড়ানো,—যেন মুহূর্ত্তে সম্পাদিত হ'য়ে গেছে!

সন্দিগ্ধভাবে রমাই জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! তোরা সব পাঠশালে যাস্‌নি?...আনন্দর কি হয়েচে?

ভয়ের চোটে আদম ব'লে ফেল্‌লে—গোঁসাইজীর কাছে গাঁজা খেয়ে—

রমাই পণ্ডিত উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাইকদের ব'ললেন—বাড়ী নিয়ে যা।...শাদ্‌রা! মেরে চামড়া তুলে দেব। আর যদি কখনো এ মুখো হও,...

সকলে ভোঁ দৌড় দিলে, একজনও আর পেছন ফিরে চাইতে সাহস করলে না।

আশ্রমে, পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে যোগীবেশী রঘুনাথ ভাবলে—"মনটা এমন খুঁৎ খুঁৎ করে কেন?"

* * * * *

আশ্রমের উত্তরাংশে, শান্তিরামের মদের দোকান এবং তারই গা-ঘেঁসা দ্বিজদত্তর গাঁজার দোকান। শুঁড়ীজাতির 'শাহা' উপাধির বালাই নাই, সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের ভেতর, মাতালদের মদ খেতে নিষেধ করার অপরাধে, শান্তিরামের লাঠির গুঁতোয় আহত হ'য়ে সাতজন লোক হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়েচে।

কিন্তু এই ঘটনার পরেও বালকযুবক- বৃদ্ধ মিলে অনেকে মাতালদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দোকানে আসবার পথে, গ্রামের মধ্যেই শান্তিরাম যখন দেখ্‌তে পেলে প্রায় আট দশজন মাতালকে হাতে পায়ে ধরে কারুকে নগদ টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে এরা সব বিদায় ক'রে দিলে, তখন ক্ষতির ভয়ে তার ধৈর্য্যরক্ষা করা বাস্তবিকই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ালো। সে অনেক মিনতি করলে, পূর্ব্বের আহতদের মতই মেরে হাঁসপাতালে পাঠাবার ভয় দেখালে, তবু কেউ নড়লো না এবং সাহসে বুক ফুলিয়ে কর্ত্তব্যের পথেই এগিয়ে চল্‌লো। শান্তিরাম

চীৎকার ক'রে ব'ললে—ঘরের পয়সা খরচ ক'রে মদ গাঁজা খাবি, ভয়ে তোরা পিছিয়ে যাচ্ছিস কেন? মাতাল হওয়ার বাহাদুরী আছে। ক'ব্যাটা পয়সা খরচ করে মদ খেতে পারে? যারা সত্যিকার মাতাল তাদের চক্ষুলজ্জা করলে নেশার সুখ মাটী হ'য়ে যাবে। ভয় কি? যা সব, দোকানে যা, যারা সুমুখের দিকে এগুতে না পারবি, তারা পেছনের দিকে আয়, দ্বিজখুড়োর জানালা দিয়ে গাঁজার মোড়ক পাবি, আমার পেছনের, ছোট্ট দরজা দিয়ে মদের বোতল পাবি, চ'লে আয় সব। ভয় কি, আমি তোদের সহায়। আয় সব!

যারা আসল নেশাখোর, বাস্তবিকই যাদের মদ কিম্বা গাঁজা নইলে চলে না, তারা শান্তিরামের অভয়বাণী শুনে, নির্ভয়ে, অকুণ্ঠিত হ'য়ে সুকুমার বালকদের ধাক্কা দিয়ে সরাতে সরাতে এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো।

—সুমুখে এসে দাঁড়ালো—আলুলায়িত কুন্তলা, মাতা অভয়ার মূর্ত্তিতে মেনকাদেবী।

—বাবা সকল! ভাই সকল! ব'লতে পারো—দিন গেলে তোমরা কত টাকা উপায় করো? ব'ল্‌তে পারো—তোমাদের সংসারে কতগুলি প্রাণী আজ তোমাদেরই মুখ চেয়ে ব'সে আছে? বাবারা! ভাই সব! মদে মানুষকে পাগল করে, উচ্ছন্নের দোরে ঠেলে দেয়,—আত্মার চেয়ে যারা বড়,—সেই পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-ভাই-বোন্‌-মা-বাবা—সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে পথে বের করে দেয়,—তবু তোমরা তাই খাবে? কত টাকা তোমরা চাও? কি তোমাদের অভাব? যা চাইবে,—আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তাই দিচ্ছি, পায়ে পড়ি তোমাদের, ওপথে আর যেয়ো না। বিষ—বিষ—ও, আত্মহত্যা কো'রো না বাবা সকল! আপনি মরে আর পাঁচজনকে মেরো না, দেশকে ধ্বংস কোরো না।

শান্তিরাম বিকট হাসি হেসে ব'ললে—এর চেয়েও যদি হীনপ্রবৃত্তি কিছু থাকে, তার আবিষ্কার একদিন তুমিই করবে মেনকা!... ভদ্রমহিলার উপযুক্ত কাজে আজ নেমে এসেচ কিন্তু!

মেনকা ভীষণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে শান্তিরামের পানে দূর থেকেই একবার চেয়ে দেখ্‌লে। তাকে একটা কথাও না বলে, সমাগত ব্যক্তিদের সুমুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে ব'ললে—পায়ে পড়চি তোমাদের। পায়ের তলে প'ড়ে যদি আত্মহত্যা করতে বলো, যদি আমার জীবনান্ত হলেও তোমাদের মদে-গাঁজায় অরুচি হয়, বলো—টুটি টিপে আপন প্রাণ আপনি নষ্ট করে ফেল্‌চি।...আমি বেঁচে থাক্‌তে, কোনো রকমেই ও-মুখো তোমাদের হতে দেব না—। পায়ে ধরি ফিরে চলো।

শান্তিরাম আবার হেসে উঠ্‌লো।

যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা পিছিয়ে পালালো, একজন মেনকার পা-তলায় প'ড়ে ব'ললে—মা! প্রতিজ্ঞা করলাম—ও বিষ আর কখনো স্পর্শ করবো না।

মেনকা তাকে হাতে ধরে তুলে, ব'ললে—অভাবে, সুখে, দুঃখে, যখন-তখন, তোমরা আমার আপন হ'য়ে থাকবে। যতদিন আমি আছি, জেনে রেখো ভরতপুরের সর্ব্বনাশ কিছুতে হবে না। হ'তে আমি দেব না। বিধাতার আশীর্ব্বাদে এতদিনে তোমরা সুখের মুখ দেখ্‌বে।

সমস্তদিন অভুক্ত থেকে, মেনকা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালো। সূর্য্যাস্তের পর দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরবার পথে, মেনকাকে দেখে শান্তিরাম ব'ললে—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না মেনকা!...আজ আমার বিক্রীর খাতায় প্রকাণ্ড একটা শূন্য পড়্‌লো।

ঈষৎ হেসে প্রবল পরিতৃপ্তির সঙ্গে মেনকা ব'ললে—যদি অনুমতি

করেন, ঐ শূন্য আরো ডাইনে গোটাকতক বাড়িয়ে দিয়ে, বাঁ দিকে কিছু অঙ্কপাত ক'রে যা হবে, আমি কৃতার্থ হ'য়ে আপনাকে তাই দিয়েই আপনার ক্ষতি পূরণ করবো। এখনো এ পথ থেকে ফিরে আসুন। যারা শিখেচে, তাদের ছাড়াবো, ভার আমি নিচ্ছি। ভরসা থাকবে—নতুন করে আর কেউ শিখ্‌বে না।

হেসে শান্তিরাম ব'ললে—সে হয় না মেনকা।...এর নাম ব্যবসা।

মেনকা আর কথা কইলে না। ধীরে ধীরে কতকটা লঘু আর কতকটা গুরু চিন্তায় মন ভ'রে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

তখন আনন্দজীবন দ্বিতলের একখানা ঘরে ব'সে, হাততালি দিয়ে সুরু ভেঁজেচে—

নাচে কালা রঙ্গে রাখালের সঙ্গে
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে বাঁশরী বাজায়।



আনন্দজীবনের গঞ্জিকাসেবন ও যাত্রাদলের সঙ্গীত-প্রিয়তা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ রমাই পণ্ডিতের মুখ থেকেই মেনকা জান্‌তে পারলে, কিন্তু আনন্দকে সে তিরস্কার করলে না। সে চিন্তিত হ'ল—ভরতপুরের ভবিষ্যৎ ভেবে।

দশটা বাজ্‌তে বাজ্‌তেই আনন্দ বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হ'য়ে মেনকার কাছে এসে ব'ললে—যাবো মা?

—কোথা?

—মাতালদের পাড়ায় পাড়ায়?

মেনকা চিন্তিত হ'ল।

আনন্দ ব'ললে—গোঁসাইজীর ওখানে আর আমি যাবো না মা!... ওরা সব কাল আমাকে গাঁজা খাইয়ে দিয়েছিল। ঐ লাদ্‌রা ছোঁড়া ভয়ানক দুষ্টু।...হ্যাঁ মা!—আমাদের বাড়ীতে একদিন যাত্রা গাওয়াবে? এম্‌নি সব মিষ্টি মিষ্টি গান আছে—সেই চিত্রাঙ্গদা পালায়, তোমাকে আর কি ব'ল্‌বো মা!

মেনকা ব'ললে—যাত্রার দলে মিশে প'ড়িসনি যেন। আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি কর আনন্দ!—আর কোনো দিন ঐ লাদ্‌রার দলে আর মিশ্‌বিনি।

একান্ত দুঃখিত হ'য়ে আনন্দ ব'ললে—গানখানা যে সব আমি শিখে-নিতে পারিনি মা! দলে মিশ্‌বোনা, কেবল লাদ্‌রার কাছে গিয়ে—

—না না, লাদ্‌রার কাছে যেতে হবে না। গান শিখ্‌তে যদি সাধ

হ'য়ে থাকে, আমি ভাল মাষ্টার রেখে গান শেখাবো। ওরা সব গাঁজা খায় আনন্দ,—সে কথা তো তুই-ই বল্‌লি!

আনন্দ খুসী হ'য়ে ব'ললে—আচ্ছা যাবো না তবে। কিন্তু নতুন মাষ্টার রাখ্‌বে, কোন্ মাষ্টার? যাত্রার দলের ভজহরি বাবু?

—না না ভজহরি নয়, ক'লকাতা থেকে ভাল মাষ্টার আন্‌বো, খুব ভালো গায় সে।

—'আচে ঘালা রঙ্গে'—ও গানখানা জানে সে?

—জানে বইকি।

আনন্দ সে এক রকম নাচ্‌তে নাচ্‌তেই বই দপ্তর বগলে করে পাঠশালে চ'লে গেল।

মেনকা তার যাওয়া পথের পানে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌লে—জন্ম দিয়ে এই নিষ্পাপ শিশুকে এমনি অবস্থায় রেখে পালিয়ে র'য়েচ যে, আজ তোমার ভয়াবহ পাপের পরিণাম ভেবে আমারই সারা অঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। তুমি হয়তো নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়ে রয়েচ। স্ত্রীর ভাবনা, পুত্রের ভাবনা যার মাথায় আসে না—সে সংসার করে সংসারী সেজেছিল—কোন্ লজ্জায়?......আমার কথা আমি ধরি না, আমি তো এ জন্মের মত চিরবঞ্চিতা হ'য়েই জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু আমার উপরেও কি তোমার কর্ত্তব্য ছিল না?

রমাই পণ্ডিত এসে ডাক্‌লেন—মিনুদিদি!

মেনকা চোখ দুটো অলক্ষ্যে মুছে, ধরা গলা পরিস্কার ক'রে ব'ললে—কি হ'য়েচে পণ্ডিতদা?—অমন ব্যস্ত হ'য়ে যে?

রমাই সত্য সত্যই ব্যস্তভাবে এসেছিলেন। ব'ললেন—রঘুনাথ

গোঁসাই ব'লে যে সন্ন্যাসীটি গঙ্গার ধারে আশ্রম বেঁধে বাস করছিল,—ঐ যে কাল যেখানে আনন্দ গিয়ে—

—হ্যাঁ, কি হ'য়েচে তার ?

—বাজার ঢুকতে বড় রাস্তার মোড়টায় দাঁড়িয়ে, না হবে পঞ্চাশজন লোক নিয়ে বলে—গাঁজা না হ'লে আমার ভোলানাথের ভোগ হবে না।...আমাদের লোকজন নিয়ে কি তাদের বাধা দেব ?

মেনকার মনে হ'ল—জয়ের রক্ত নিশানটা আর বুঝি সে আপন কম্পমান হাতের মুঠোয় ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু অনুভব করলে—বুকে তার অসীম বল। রক্তের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার খরস্রোত বইতে সুরু হ'য়েছে। ব'ললে—পঞ্চাশ জনের সঙ্গে কেন, দুশো জনের সঙ্গেও লড়াই করবার মত লোকের তো আমাদের অভাব নেই পণ্ডিতদা ! কিন্তু জোর করে কি হবে ? ধ্বংস-মুখের গোড়া থেকেও যারা সাধ্য-সাধনায় ফিরলো না, তাদের কেমন করে আজ ফিরিয়ে আনি ?—কিন্তু সন্নেসী ঠাকুর কি বলে ?—গাঁজা না হ'লে তার ভোলানাথের ভোগ হবে না ?......

—হ্যাঁ।

মেনকা মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লো।

রমাই অস্থির হ'য়ে ব'ললেন—কি করবো দিদি ? আমার ভয়ানক ভাবনা হচ্ছে। ছেলের দলকে পাঠিয়েচি সেখানে। যদি কোনো—

মেনকা ব'ললে—যারা গেছে, তারা তো মারবো ব'লে যায়নি পণ্ডিত দাদা !—তারা গেছে প্রয়োজন হয়তো মার খাবো ব'লে। সুতরাং মারেই যদি, নতুন ঘটনা কিছু ঘটবে না তাতে।...আপনি এক কাজ করুন—

আবার 'তোরা মানুষ হ'—



"দোহাই আগাসাহেব! বেশী না বাবা!—দশটা টাকা! ৯ নম্বর ঘোড়া"

সন্নেসীটাকে আজ্‌কের মত আর বাধা দেবেন না। দেখি কাল যদি অন্য রকম কিছু ভেবে ঠিক করতে পারি।

রমাই ব'ললেন—কিন্তু আজ একসঙ্গে যা কিনে রাখ্‌বে, তাতে এখন দশদিনের জন্যে ওদের কোন ভাবনাই থাকৃবে না।

মেনকা হেসে ব'ললে—ভুল পণ্ডিত দা!...বেশী পেলে খাওয়ার মাত্রাও ঘন ঘন বাড়বে। সে জন্যে ভাববেন না আপনি। কাল না হোক্ পরশুই আবার সমান ভাবে চাহিদা বেড়ে যাবে।

রমাই পণ্ডিত কতকটুকু নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন।

মেনকা দারোয়ান ডেকে আদেশ করলে—যাত্রার দলের ভজহরি মাষ্টারকে ডেকে আনতে। তারপর আহারাদি সমাপনান্তে দ্বিতলের—অফিস ঘরে একাই ব'সে ব'সে ভজহরির অপেক্ষা করতে লাগলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভজহরি এসে অতি বিনীত হ'য়ে মাথা নত করলে।

মেনকা জিজ্ঞাসা করলে—আপনিই যাত্রাপাটির মাষ্টার মশায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।...

ভজহরির বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা ছিল না। এতদিনের মধ্যে আর কখনো সে মেনকার অসামান্য তেজঃসম্পন্ন মহিমাময়ী মূর্ত্তি চোখে দেখেনি। তথাপি সে মুখ তুলে চাইতে পারছিল না। যেন সে অপ-রাধীর কাঠ্‌গড়ায় বিচারার্থ আনীত।

মেনকা ব'ললে—আপনার নাওয়া-খাওয়া হ'য়েচে?

—আজ্ঞে নাওয়া হ'য়েচে।

—খান্‌নি এখনো?...কি সর্ব্বনাশ! খেয়ে এলেই তো পারতেন।...

তারপর চীৎকার করে ব'ললে—ওরে শীগ্‌গীর মাষ্টার বাবুকে ভাত

দিতে বল্।...পাশের ঘরে ঠাঁই করে দে।...তারপর মাষ্টার মশায়!—আপনার বাড়ী কোথা? ভরতপুরে নিশ্চয় নয়?

—আজ্ঞে না, বাড়ী আমার জালালপুর।

—এখানে মাইনে পান কত করে?

—তার কোনো ঠিক নেই। দলের কর্তা যাঁরা, তাঁরাই দয়া করে কখনো কখনো কিছু কিছু দেন, আর ছেলের দল চাল-ডাল যোগায়, মাছ-তরকারী সাধ্যমত কখনো খরিদ করি, কখনো বা সিধে পাই... একবেলার বেশী রান্না হয় না। খাওয়াটাও সবদিন ভাল ভাবে শেষ হয় না।

—তবু মাস গেলে গোটা পঁচিশ টাকা হয় তো?

—দাঁতে জিভ্ কেটেই মাষ্টার ভজহরি মাথা হেঁট করে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে ব'ললে—পাঁচটা টাকা পে'লেই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করি।

—আপনার ঘর সংসার এই পাঁচ টাকাতেই চলে?

—আজ্ঞে না। অদৃষ্ট চালায়।

—যাত্রার দল চ'ল্‌ছে কেমন?

—অচল হ'য়ে তো সংসারে কোনো জিনিস থাকে না মা! হাত-পা ভাঙা, পঙ্গুর মত গড়িয়ে গড়িয়ে চ'ল্‌ছে।...ভদ্রলোকের ছেলেরা সখ্ করে করেছে...তা-ও পোষাকের ব্যাপার নিয়ে ক'দিন ধরে মহা হাঙ্গামা চ'ল্‌লো।

উত্তেজিত হ'য়ে মেনকা ব'ললে—ভদ্রলোকের ছেলেরা সখ্ করে করেছে? এই কি তাদের সখ্ করবার সময়? দেশের লোক অধঃপাতে যেতে ব'সেছে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঙলা উচ্ছন্নের দোরে

হাজির হ'য়েচে,—এখন ভদ্রলোকের ছেলেরা যাত্রার দল করে সখ্ মেটাবে ?...তাদের বলুন,—সখ্ ক'রে—গাঁয়ে অশিক্ষিতদের শিক্ষা দিতে, বলুন—সখ্ করে মাতাল-গাঁজাখোরদের নেশা ভাঙাতে, সখ্ করে হাঁসপাতালে রোগীর সেবা করতে বলুন, সখ্ করে গঙ্গাস্নানার্থী বিপন্নদের স্বেচ্ছাসেবক হ'তে বলুন। সখ্ করে গাঁয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা চরকার ইস্কুল খুল্‌তে বলুন।...পয়সার খরচ তো এতে নাই, আছে বুদ্ধির আর প্রবৃত্তির সঙ্গে দেনা-পাওনা।...কিন্তু আপনি আগে খেয়ে আসুন, তারপর অন্য কথা হবে।

মাষ্টার অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে আহারের স্থানে গিয়ে ব'সলো।

মেনকা ঘরে ব'সে, একখানা কাগজে খচ্ খচ্ করে অনেকখানি লিখে একখানা খামের মধ্যে এঁটে ফেল্‌লে। তারপর আস্তে আস্তে ভজহরি মাষ্টারের আহার স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভজহরি কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো।

মেনকা ব'ললে—আমি অত্যন্ত সাধারণ স্ত্রীলোক, বয়সে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, বাড়ীতে আপনার বোন্ টোন্ নেই মাষ্টার মশায় ? —আমাকে তাই ভেবে নিন না!...লজ্জা করবেন না। যা যা ভাল লাগে, চেয়ে নেবেন।

ভজহরির মনে মনে ভারি আনন্দ হ'ল। এই বিশাল বিত্তের অধিকারিণী মহিমাময়ী নারী, এত কোমল এত উদার এত উন্নত! অথচ এমন সাধারণ!

মেনকা ব'ললে—আপনার মাস মাস গোটা পঞ্চাশ করে যদি মাইনে হয়, খুব সচ্ছলে সংসার চলে বোধ হয়, কেমন ?

—আজ্ঞে রাজার হালে। মাসে মাসে দু'পাঁচ টাকা জমেও।

—কিন্তু যাত্রার দলটা না ছাড়লে তো অতটাকা আপনার উপার্জ্জন হবে না, ভজহরি বাবু!

ভজহরি আহার বন্ধ রেখে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

মেনকা হেসে ব'ললে—খাওয়াটা বন্ধ রাখছেন কেন? খেতে খেতে গল্প করতে পারেন না?...কেমন করেই বা পারবেন,—হাত পুড়িয়ে রোজ ঐ দেবেন দাসের অন্ধকূপ-হত্যের ঘরখানায় পাকা পটল আর পচা চিংড়ীর ঘণ্ট রাঁধ্‌তে হয় কিনা!...অথচ ভদ্রলোকের ছেলেদের সখ্‌ মিটিয়ে দেওয়ার আপনিই হ'লেন মুখপাত!...অদৃষ্ট আর বলে কাকে! আচ্ছা মাথায় বড় বড় চুল রেখেচেন কেন ভজহরি বাবু?—সখ্‌ করে? জটা বাঁধ্‌তে সুরু হ'য়েচে কেন?...যাত্রার বাবুরা তাদের মাষ্টারের জন্যে মাখ্‌বার তেল টুকুও যোগাতে পারে না বুঝি?

ভজহরি মাটীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ব'ললে—আজ্ঞে মাখ্‌বার তেল টেল গুলো গাঁয়ের সবাই মিলে বকুল তলায় রুদ্র দত্তর দোকানেই নেয়। তা দিন গেলে দেড়পো আধ্‌সের তেল লোকের মাথ্‌তেই খরচা হয়।

—রুদ্র দত্তর মুখথেকে আপত্তি ওঠে না?

—মনে মনে নিশ্চয় ওঠে। মুখ ফুটে কিছু বলে-নি।

মেনকা মৃদু হেসে বললে—ভদ্রতা মন্দ নয়! কিন্তু আপনি এক কাজ করুন, মাইনে ঠিক পঞ্চাশ টাকা করেই আপনাকে দেব, আপনি—

—আজ্ঞে হাঁ, যাত্রার দল আপনার আদেশমতই তা হ'লে চ'ল্‌বে। পোষাক কিন্‌তে যদি শ'কতক—

—না না, চুলোয় যাক্‌—ধ্বংস হোক্‌ আপনার যাত্রা। আমি কোনোদিনই তার উন্নতি চাইনি।...আজ থেকে যাত্রার সম্পর্ক আপনি

ছেড়ে দিয়ে, আমার এখানে কাজ কর্ম্ম করুন। কিন্তু আগে যে সব কাজ বললাম,—ঐ যে চরকা কাটা, মাতালদের মদ না খেতে খোসামুদী করা, মূর্খদের লেখাপড়া শিখানো,—এই সব কাজ যদি আপনার দলের ছেলেরা চালিয়ে, যাত্রার দল করে, আর তাদের নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ রাখে, আমি সত্যিই পোষাক কিনতে এবং যা যা কিনতে যত টাকার দরকার হয়, হাস্তে হাস্তে দিয়ে দেব। কিন্তু সাবধান! চরিত্র দোষ—মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ।

ভজহরি আহারান্তে উঠে ব'ললে—আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে রাজী আছি। দলের সকলকে ব'লে দেখ্‌বো, যদি তারা রাজী হয়।

—রাজী হবে না?—সন্দেহ আছে? তবে মাষ্টারী করলেন এতকাল কি ভূতের দলে? যদি চরিত্র বজায় রেখে কর্ত্তব্যে অবহেলা না ক'রে যাত্রার দল হয়, আমি হাস্তে হাস্তে আমার আনন্দকেও সে দলে ভর্ত্তি ক'রে দেব। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চাকে আমি মন্দ তো বলিনি মাষ্টারমশায়! আমি আশঙ্কা করি—লেখাপড়ায় শিথিলতা আসে, আর যাত্রার পার্ট মুখস্থ করতে করতে নৈতিক চরিত্রে ঘুন্ ধরে যায়।...আনন্দর আমার রাখাল-বালক সাজ্‌তে ভারি সাধ।...কিন্তু দেশের যা অবস্থা, আপাততঃ ও সব ঝোঁক্ থেকে দূরে থাকাই উচিত।

ভজহরি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'ললে—আমি আপাততঃ আজ থেকেই ও সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছি।

—বেশ, কাল থেকে আমার এখানেই বাসা নেবেন।...কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, যদি কিছু মনে না করেন—

থতমত খেয়ে মাষ্টার ব'লে উঠ্‌লো—বলুন না রাণীমা! আপনার কাজ করা যে আমাদের জীবনে মহা সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তখন মেনকা ক্ষণপূর্ব্বেকার লিখিত খামে আঁটা পত্রখানা ভজহরির হাতে দিয়ে ব'ললে—যদি দয়া করে, কোনো বিশ্বাসী লোকের হাতে দিয়ে এখানা রঘুনাথ গোঁসাইএর কাছে পাঠিয়ে দেন—

—"আমি নিজে গিয়ে আপন হাতে তাঁকে দিয়ে আস্‌চি—এক্ষুনি" ব'লে ভজহরি চিঠি নিয়ে, মেনকাকে নমস্কার ক'রে, বিদায় নিলে।

ঠিক এম্‌নি সময় একজন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সংবাদ দিলে—"শান্তিবাবু আনন্দ জীবনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।"

মেনকা দৃঢ় হ'য়ে সুমুখের টেবিলটা দুহাতে চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় সে? একা তাঁর মাথা, না দলের আর কারো—

—আজ্ঞে তিনজনকার। খোকাবাবুকে বাড়ী আনা হচ্ছে,—অন্য সবাইকে হাঁসপাতালে—

—"সকলকে হাঁসপাতালে পাঠাও!" বলে মেনকা তৎক্ষণাৎ ভবতোষকে জরুরী 'তার' ক'রে দিলে।



রমাইপণ্ডিতের সঙ্গে আর মেনকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।

রমাই ব'ললেন—সহিষ্ণুতার বাইরে যা, তা সহ্য হবে কেমন ক'রে ?

মেনকা প্রকাণ্ড হাসি হেসে জবাব দিলে—জগতে সহিষ্ণুতার বাইরে কি কিছু আছে পণ্ডিত দাদা ?—এ কথা যে আপনিই একদিন আমায় শিখিয়েছিলেন ?

রমাই ব'ললেন—ক্ষমতা নেই তবু বৃথা এই আস্ফালন ।

কথার মাঝখানেই মেনকা বলে ব'স্‌লো—যদি বাস্তবিকই আস্ফালন বৃথা হ'ত, তা-হলে এতগুলো লোকের রক্ত পাত হ'ত না, আনন্দর মাথাটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যেত না। নিশ্চয়ই আস্ফালন করবার মত কিছু আছে বই-কি।...আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন পণ্ডিত দাদা ! যে, বিচারের জন্য আমাদের যেখানে গিয়ে আজ দাঁড়াতে হবে, সেখানে আমরাই হবো—সব চেয়ে বড় আসামী। প্রতিকারের পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে, আরো দুশো-রকমের দোষ আমাদেরই ঘাড়ের উপর চেপে পড়বে। অথচ ভগবানের দরবারে আমাদের দাবীটা এতক্ষণ ভালরকম করেই পেশ হয়ে গেছে।... কিন্তু আপনি কি আজ আনন্দর মাথা ফেটেছে দেখেই আন্দোলন বন্ধ করতে চান পণ্ডিত দাদা ?

রমাই বললেন—বন্ধ করতে আমি বলিনি ভাই ! কিন্তু বলবার শক্তি-ও কমে আস্‌চে। শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে,—যারা সব আর কখনো খাবো না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে, তারাই আবার লুকিয়ে লুকিয়ে—

মেনকা জোরে হেসে উঠ্‌লো। ব'ললে—একটুও নতুন খবর আপনি দিতে পারলেন না পণ্ডিতদাদা! এ রকমটা যে সর্ব্বত্রই হয়, তা আমি জান্‌তাম।...মাতালদের দস্তুরই তো এই। যারা পয়সা খরচ ক'রে হীন হ'তে চায়, তারা এত সহজে কি উচু হ'য়ে দাঁড়াতে পারে?... চিরকাল লেখাপড়ার চর্চ্চা আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন—মাতাল নেশাখোরের সঙ্গে তো কোনোদিনই আপনার কারবার ছিল না কিনা, কেমন করেই বা জানবেন।...কিন্তু ওসব চর্চ্চা এখন বন্ধ থাক্।...চলুন হাঁসপাতালে যাই।

রমাই ব'ললেন—পাল্কী আন্‌তে বলি?

মাথানেড়ে মেনকা ব'ললে—যার পুত্র আজ হয়তো বা মৃত্যুর জন্যই হাঁসপাতালে শয্যা বিছিয়েচে—তার কি পাল্কী চড়া সাজে পণ্ডিতদাদা? তা-ছাড়া সমস্ত ভরতপুর আজ বিপন্ন, আমি মনেপ্রাণে তার কল্যাণার্থী হ'য়ে, কোন্ মুখে বিলাসিতা দেখাবো?...আজ শুধু মনে হচ্ছে আমার,—কতকগুলো স্বার্থান্ধ লোকের জন্যই আজ দেশের এই দুর্দ্দশা। নইলে শান্তিরামের মত জমিদার-নন্দন আমার আনন্দর মাথায় লাঠির ঘা মারে? তুচ্ছ তার ধনের গর্ব্ব, আজ যার একখানা দোকানের আয় থেকে চারটে শান্তিরামের জমিদারী খরিদ করা চলে, সেই-ই পড়ে রইলো—মরণের আক্রমণে।...কিন্তু আর দেরী করে ফল নেই, চলুন রওনা হওয়া যাক্।...সন্ধ্যের আগেই আবার ফিরে আস্‌তে হবে।.........

* * * আনন্দজীবনের আঘাত সত্যসত্যই খুব গুরুতর হ'য়েছিল। সমস্ত মাথাটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা প'ড়ে গেছে। খাটের উপর একান্ত নির্জীবের মতই দুগ্ধপোষ্য শিশু শুয়ে আছে। বাহ্য লক্ষণ দেখে জ্ঞান আছে কি নাই বোঝা যায় না।

মেনকা স্থির অপলক নেত্রে তার হৃদ্‌পিণ্ডসম যত্নের ধন এই বালকের যাতনা-কাতর ম্লান মুখখানার পানে চেয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিনিটকতক দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আনন্দর পাশে না ব’সেই সে অন্য অন্য আহতদের শয্যার পাশে পাশে ঘুরে, সকলের অবস্থা খুঁটিনাটি ভাবে দেখে নিলে। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফিরছিলেন।......হাঁসপাতালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরগুলোর মধ্যে এক বিরাট গাম্ভীর্য্য অনুভূত হচ্ছিল।

ডাক্তারবাবু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আনন্দকে অন্য এক নির্দ্দিষ্ট ঘরে একা রাখা হোক্ এবং পৃথক্ শুশ্রূষাকারী তার শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বদার জন্যই মোতায়েন্ থাক্। কিন্তু মেনকা তা হ’তে দেয়নি। সে ব’লেছে—আমি ‘মা’ নামের অগৌরব করবো না। এরা যে সকলেই আমার ছেলে, আমারই কথায়—

তার শুক্‌নো চোথ দুটো এতক্ষণে অশ্রুভারে টল্‌টল্ ক’রে উঠ্‌লো।...

মেনকা আনন্দর খাটের পাশে এসে ব’স্‌লো। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—ছোঁব?...ঘুম ভাঙ্‌বে না?

ডাক্তার অনুমতি দিতেই, মেনকা বালকের ঠোঁট দুটোর ফাঁকে আঙুল দিয়ে, আপন মুখে স্পর্শ করালে, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে ব’সে রইলো।

রমাই পণ্ডিত তখনো হল ঘরটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

দুজনেরই বুকের মাঝে ভীষণ তুফান স্তব্ধভাবে ওৎ পেতে র’য়েচে—ফাঁক পেলেই যেন সব ভেঙে চুরমার ক’রে দিয়ে যাবে। বুকের এক একখানা হাড় ভেঙে গুঁড়ো হবে, চোখের জলে সাত সমুদ্রের জল বেড়ে উঠ্‌বে।...

মেনকা সহসা রমাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো—ঐ ভণ্ড সন্ন্যাসীটার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে পণ্ডিত দাদা ?

—কে—রঘুনাথের সঙ্গে ?

—হ্যাঁ ?

—চোখের দেখা দেখেছি অনেকদিন। কিন্তু আলাপ করবার মত প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু কেন ?

ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন—গোলমাল হচ্ছে।

মেনকা চুপ ক'রে ভাবতে লাগ্‌লো।...

অন্ধকারের কালো ছায়া নয়নের সম্মুখে তার বিরাট আসন বিছিয়ে নিচ্ছে। ভবিতব্যের পাতায় কি যে লিপিবদ্ধ আছে অস্পষ্টতার জন্য কিছুই আর নজরে পড়ে না!...

আনন্দ চোখ মেলে চাইলে।

—মা!

মেনকা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে, ধরা গলায় সাড়া দিলে—বাবা! আনু-ধন আমার!

আনন্দর চোখ্ মুখে মেনকার অশ্রু ঝরে পড়লো।

আনন্দ ব'ললে—কাঁদ্‌চো মা ?

—না বাবা, কাঁদিনি তো।

—ঐ যে তোমার চোখের জলে মুখখানা আমার ভেসে গেল!

...রমাই তাড়াতাড়ি অনেকখানি দূরে গিয়ে অন্য একজন আহতের শয্যাপার্শ্বে ব'সে পড়লেন।

আনন্দ খানিকক্ষণ দম্ নিয়ে, আস্তে আস্তে ব'ললে—গোঁসাইজির তো দোষ ছিল না মা! ঐ সব গয়লা আর চাঁড়াল, সবাই মিলে লাঠি

মারলে।...আমাকে চিন্তে পারলে কেউ মারতো না।...আমি সকলকার আগে গিয়েছিলাম কিনা, তাই আমার মাথাটায় আগে লাঠি প'ড়েছিল।

মেনকা স্তব্ধ হ'য়ে ভাব্তে লাগ্লো—তবে যে সে খবর পেলে শান্তি বাবুর...

পুত্রকে ব'ললে—আজকের মত বেশী কথা ক'স্নে আয়!...আজ চুপ্ ক'রে থাক্ বাবা!

আনন্দ ব'ললে—রাতের বেলায় আমাকে বাড়ী নিয়ে চলো মা! আমি একা থাক্তে পারবো না।

মেনকা পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ব'ললে—বাড়ী নিয়ে যেতে ডাক্তার বাবু নিষেধ করছেন যে যাদুমণি!..ভয় কি? আমি সারাটি রাত তোমাকে কোলে ক'রে ব'সে থাক্বো।

আনন্দ চুপ ক'রে রইলো।

মেনকা ব'ললে—ঘণ্টাখানেক একলা থাক্তে পারবি বাবা? এক ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আস্বো।

আনন্দ ব'ললে—সারা রাতও পারবো মা!...তোমার কাজ থাকে তো তুমি বাড়ী যাও।...ঐ তো শাহাবুদ্দিন, লখাই, পচা—সকলেই পড়ে রয়েচে। বিমলার খাটখানা তো আমারই কাছাকাছি। ভাল থাক্লে গল্প করবো। একটুও মন খারাপ করবে না। তুমি ভেব না মা! ...আচ্ছা মা!

—কি বাবা?

—দাদামশায় কবে আস্বেন?

—কেন বল্তো?...দাদামশায়কে দেখ্তে ইচ্ছে হচ্ছে?

—হুঁ।

—আমি তাঁকে খবর পাঠিয়েছি আনু! কাল ভোর বেলাতেই তিনি এসে পড়বেন।

...ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হ'ল।

আনন্দ ব'ললে—কই গেলে না মা?

মেনকার কি উঠে যাওয়ার শক্তি ছিল?...চির পিয়াসী সন্তান-কাঙালীর শুষ্ক বুকে স্নেহ-শতদলের আভা ছড়িয়ে প'ড়েচে—সেই দিন থেকে, যেদিন থেকে আনন্দজীবন তার জীবনের জীবন হ'য়ে তার বুকের নিভৃতে আশ্রয় নিয়েচে! আজ সেই আনন্দজীবন মরণের সন্ধিতে!... কোন্ পরাণে মেনকা তাকে ছেড়ে অন্য কাজের জন্য পা বাড়াবে?...কিন্তু কর্ত্তব্য!...এই কর্ত্তব্যের ধার শোধ করতেই তার এ হেন দুর্দ্দশা!—হয়তো জীবনাধিক প্রিয়কে চিরজন্মের মতই ডালি দেওয়ার ভয়াল মুহূর্ত্ত তার সকল কাজের পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আজ!

আনন্দ পুনরায় ব'ললে—যাও মা!...যদি থাকতে না পারো, আবার এসো।...কাজ আছে ব'লছিলে যে?

মেনকা দুটি হাতে আনন্দর মুখখানা ধরে খানিকক্ষণ নির্ণিমেষে চেয়ে থেকে থেকে, আপন মুখখানা তার মুখের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়ালো। তারপর আর পিছন ফিরে চাইলে না। কেবল একটা কথা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল—পণ্ডিত দাদা!

রমাই প্রস্তুত হ'য়েই অপেক্ষা করছিলেন।......হাঁসপাতালের ফটকে এসেই রমাই থমকে দাঁড়ালেন।

মেনকা বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে—কি হ'ল?

রমাই প্রথমেই জবাব দিলেন না, আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে,

ব'ললেন—একটুখানি দাঁড়াও দিদি! হাঁসপাতাল থেকে জন চার লোক নিয়ে আসি।

—কেন?

—জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে হবে কিনা, সাবধান হওয়া ভাল।

মেনকা দৃঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—কিচ্ছু দরকার নেই পণ্ডিত দা! কোনো বিপদকেই আর গ্রাহ্য করবো না আমি!...আপনি চলুন।

রমাই কিন্তু সে কথা শুন্‌তে চাইলেন না, তিনি লোক ডাক্‌বার জন্যই এগিয়ে গেলেন, মেনকা তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধ'রে ব'ললে—আমি ব'ল্‌ছি পণ্ডিত দাদা! কিচ্ছু দরকার হবে না। চ'লে আসুন!

রমাই কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না, কিন্তু মেনকার ঘোরতর আপত্তি দেখে মনে মনে ঈষৎ যে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, এমন কথাও বলা চলে না।...এ দেশের স্ত্রীলোকদের এ সাহসের অভাব আছে, হয়তো বা একদিন মেনকাই সে অভাব চেষ্টায় পূরণ ক'রে দেবে।...

...তৃতীয়ার স্তিমিতচন্দ্র চক্রবালের কোলে ঢ'লে প'ড়েছে। তিমিরাচ্ছন্ন পথিক-বিহীন পথ,—দুধারি জঙ্গল। শীতের কুহেলীতে দিগন্ত অস্পষ্ট

মেনকা আর রমাই, কারুর মুখে কথা নাই!

একটা অস্ফুট শব্দ আস্‌ছিল—কিন্তু প্রবল বাতাসের শন্‌শনানি তার অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুল্‌তে দেয় না।

মেনকা কথা কইলে—কি একটা শব্দ হচ্ছে না?

রমাই গম্ভীর অথচ বিরক্ত ভাবে ব'ললেন—চলো, যা হচ্ছে হোক্।

মেনকার বুকখানা সহসা ধক্ ক'রে উঠ্‌লো। রমাইএর বিরক্তি

ভাবটুকু সে লক্ষ্য করলে। কিন্তু আর কথা কইতে সাহস করলে না। শব্দের ভয়ে নয়, রমাই পণ্ডিতের ভয়ে।

মেনকা চ'লতে চ'লতে দেখতে পেলে—রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের কিনারা দিয়ে কে একজন চ'লে যাচ্ছে।—কিন্তু কী ভীষণ লম্বা তার আকৃতি!...একটা শব্দ আসছিল—ঠুং ঠুং ঠুং......

সাহসে ভর করে মেনকা হাঁকলে—কে যায়?

উত্তর এলো—পথিক।

মেনকা অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'ল। কিন্তু এর পরে আর কোনো প্রশ্নই তার কণ্ঠে যোগালো না।...পথিকের আবার নূতন পরিচয় কি আছে? সে পথিকই।

মেনকা বাড়ী এসেই দেখলে—শান্তিরাম অপেক্ষা করছে।

মেনকা অভ্যর্থনার ক্রটী রাখলে না।

শান্তিরাম ব'ললে—ফটকের কাছে আমাদের পাল্কীখানা রয়েচে, যদি অনুমতি করো, তাকে ডাকি।

—"কে? কাকে ডাকবেন?" বিস্মিত মেনকা প্রশ্ন করলে।

শান্তিরাম ব'ললে—আমার এক বোন, শ্বশুর বাড়ী থেকে আজই ভরতপুরে এসেচে।...তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে নাকি আর প্রাণে বাঁচছে না। ব'লেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

মেনকা তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলে না,—নিজেই পাল্কীর কাছে এসে,—শান্তিরামের বোনকে হাত ধরে নামিয়ে, ব'ললে—এসো ভাই! যার সঙ্গে দেখা করতে এত ব্যগ্র হ'য়েছিলে, তাকে এমনি করেই কি 'পর' ভাবতে হয়?...কিন্তু সব আগে তোমার নামটি কি বলো ভাই?

—আমার নাম লতিকা দেবী।

মেনকা, লতিকার কাঁধে হাত রেখে, ব'ললে—বা-রে বা!—জন্মজন্মকার সখীত্ব ছিল আমাদের, হয়তো দুই বোন্‌ই ছিলাম, নইলে নামের এমন মিল্ হয়?—মেনকা আর লতিকা।...আমি ভাই তোমার দিদি হ'লাম কি বলো?

সহসা লতিকা মাথা হেঁট করে—মেনকাকে প্রণাম করলে।

মেনকা তার চিবুকে হাত দিয়ে ব'ললে,—ও সব আবার কেন ভাই?

লতিকা স্মিতমুখে ব'ললে—তুমি যে দিদি!

...দ্বিতলে উঠে এসে, শান্তিরাম ব'ললে—বেড়ে মিলন হয়েছে তো ব্যাপার কি জানো মেনকা?...ভরতপুরে এসে, সব কথা শুনেই বলে—যিনি এমন করে দেশের জন্যে প্রাণপাত করছেন, তাঁকে না দেখে আমি এ বাড়ীতে কিছুতেই থাক্‌বো না।...ওর স্বামী ঠাকুরটিও তোমারই মত দেশ দেশ ক'রে পাগল!

একটা তীব্র শ্লেষের হাসি হেসে মেনকা ব'ললে—পাগল তো দুনিয়া শুদ্ধ,—খালি আপনার মাথাটা চিরকাল ভাল হ'য়ে রইলো। তারপর লতিকাকে জিজ্ঞাসা করলে—কতদিনের মিয়াদে এসেচ ভাই? মাসকতক থাক্‌বে তো? কর্ত্তাটি কোথায়?

লতিকা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—বিলেতে। একবছর পরে ফিরবেন, ততদিন আমি তোমারই সঙ্গে কাজ করবো দিদি!......আমাকে চরণে আশ্রয় দাও!...তোমার চরণ ছাড়া, সারা ভরতপুরে আর আমার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই।

শান্তিরাম জোরে হেসে উঠ্‌লো।

তীব্রস্বরে লতিকা বলে উঠ্‌লো—তোমার কি এতটুকু চোখের পর্দা

নেই দাদা! তুমি না এখানকার জমিদার? দেশের জন্যে দশের জন্যে তোমাকেই না আগে কাজে নামতে হয়?

শান্তিরাম গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—নাম্‌বোরে নাম্‌বো। আগে তোদের দৌড়টা দেখি,...কিন্তু মেনকা! এখনো যদি দয়া করো—

মেনকা অস্বাভাবিককণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—শান্তিবাবু!!

শান্তিবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস পেলে না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির গোড়ায় এসে ব'ললে—লতি, কখন্ যাবি?

লতিকা ব'ললে—তোমার মতি-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আর যাবো না দাদা!...আজ আমার মা নেই, বাবা নেই, কার কাছে যাবো?—তুমি তো আমাদের দুঃখ বুঝ্‌তে চাইলে না দাদা!

শান্তিরাম ভাব্‌তে ভাব্‌তে নীচে নেমে গেলো।

লতিকা ব'ললে—আমি ওর ভার নিচ্ছি দিদি!...তুমি ভেব' না।

মেনকা দু-হাতে লতিকাকে জড়িয়ে ধরলে।

এম্‌নি সময়ে রমাই পণ্ডিত এসে ব'ললেন—হাঁসপাতাল থেকে আর একবার ঘুরে এলাম দিদি!

মেনকা কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই, লতিকা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রমাইকে প্রণাম করলে।

রমাই বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েই, লতিকার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে ব'ললেন—লতি!...কবে এলি মা? সব ভাল?

মেনকাই লতিকার সব কথা খুলে ব'ল্‌লে। শান্তিরামের ক্ষণপূর্ব্বেকার কথাগুলোও বাদ দিলে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—হাঁসপাতালে আবার এরই মধ্যে গেছলেন?...আনু কেমন আছে?

—সামান্য সামান্য কথা কইচে। কিন্তু জ্বরটা বেড়েচে। ডাক্তারবাবু

বল্লেন—এখনো ভয়ের কারণ ঘোচেনি।...কিন্তু আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেচি মেনকা! রঘুনাথ গোঁসাই কারুর মানা মানে নি। হাঁসপাতালের নিয়ম জোর ক'রে ভঙ্গ ক'রে, সে আনন্দর শিয়রে ব'সে আছে। চেহারা দেখে মনে হ'ল—খুব অনুতপ্ত। ...শুনলাম তারও দোষ ছিল না, কতকগুলো গাঁজাখোরের নির্ব্বুদ্ধিতায়—

মেনকা ব'ল্লে—আপনি তা হ'লে বাড়ী যান। লতিকে নিয়েই আমি যাবো।

—কোথায়—হাঁসপাতালে? কিন্তু ডাক্তারবাবু কড়া ভাবে নিষেধ ক'রেছেন। অনেক লোকের থাকা সেখানে চ'লবে না। তা ছাড়া রঘুনাথ তো সেখান থেকে উঠবে না কিনা।

মেনকা ধরা গলায় ব'ললে—কিন্তু আমি কি সেখানে গিয়ে কান্না-কাটী করবো ভেবেছেন পণ্ডিতদা? আনন্দ আমার যেমন ছেলে, আমিও তার তেমনি মা!...আমি যে পাষাণী পণ্ডিতদা! চোখে আমার অশ্রুর নাম গন্ধ নাই!...

রমাই ব'ললেন—তা হোক্, তবু আজ সেখানে গিয়ে তোমার কাজ নেই দিদি! ডাক্তারের হুকুম পালন করতে আমরা সব রকমেই বাধ্য।

মেনকা ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললে—আচ্ছা তবে ডাক্তারের আদেশই বাহাল থাক্।...

রমাই চলে গেলেন।

তারপর লতিকাকে সকল কথা একটি একটি ক'রে বলে, মেনকা তাকে আহারের জন্ত ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু নিজে সে কোনরকমেই আজ মুখে আহার তুলতে পারলে না।

গল্প করতে করতে রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে পড়লো। লতিকা কোন্ ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিদ্রাবিহীন হ'য়ে মেনকা কত কথাই ভাবছিল।

নিশীথ নিস্তব্ধতার বুক চিরে গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকলে—রাণি! রাণি! ...আনন্দর মা!

মেনকা ধড়মড় করে উঠে বসলো।

—মেনকা! মেনকা!

মেনকা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুললে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী! এক হাতে তার কমণ্ডলু অন্য হাত দিয়ে কাঁধের উপর কি একটা ভারী জিনিষ চেপে ধ'রে রেখেছে।

আপন অজ্ঞাতেই মেনকা সহসা সন্ন্যাসীর পাদমূলে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সজলকণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলে—কে আপনি?

গম্ভীর অথচ কম্পিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী ব'ললে—আমি সন্ন্যাসী, আমি ভণ্ড, আমি রঘুনাথ গোঁসাই, আমি আনন্দজীবনের জন্মদাতা—আমি উমাচরণ—তোমার স্বামী!!

তারপর কাঁধের ভারী জিনিষটার অঙ্গের আচ্ছাদন উন্মোচন ক'রে ব'ললে—এই নাও মেনকা!—তোমার আনন্দকে নাও। জগতে আমিই এনেছিলাম কিনা—তাই আজ আমাকে উপলক্ষ রেখেই ও পালিয়ে গেছে।...হাঁসপাতালে ওর মুখেই আমি নাম শুনে, সব বুঝে নিয়েছিলাম।

মেনকা তখন উপুড় হ'য়ে মৃত আনন্দর মুখের উপর মুখ রেখে নিসাড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসী আবার ডাকলে—মেনকা!

মেনকা মুখ তুলে চেয়ে রইলো।

সন্ন্যাসী তার কমণ্ডলুর ভিতর থেকে তার বহুকালের আদর করা গাঁজার ক’ল্‌কেটা বের ক’রে মেনকার সাম্‌নে রেখে ব’ললে—আনন্দকে বিদেয় করে দিয়েছি, আজ এটাকেও জন্মের মত ছুটী দিলাম।......আজ থেকে আমি আবার মানুষ হবো মেনকা!...অতীতের কথা আর ভাব্‌বো না, এখন বেঁচে থাক্ শুধু বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ!...কিন্তু আমি চ’ল্‌লাম!...তোমাকে কখনো কিছু দিতে পারিনি, তাই নেবার মত যোগ্যতা আমার নেই।...আমি চ’ল্‌লাম মেনকা!...মিনু!...কিন্তু নাঃ—ও আদরের অধিকার আমার পাওনা নেই। চ’ল্‌লাম—

মেনকা চীৎকার ক’রে উঠ্‌লো—দাঁড়াও—ওগো দাঁড়াও!

সন্ন্যাসী ফিরে দাঁড়ালো।

মেনকা ধীর কণ্ঠে ব’ললে—আমি তোমার পত্নী,—ধর্ম্মপত্নী! ধর্ম্মতঃ তোমার ওপরে আমার অধিকার আছে। সেই দাবীতে বল্‌ছি—দাঁড়াও!

ক্ষীণ হাসি হেসে সন্ন্যাসী ব’ললে—পাপী কি কখনো ধর্ম্মের কাহিনী শোনে মেনকা? নইলে স্ত্রীকে সে পরিত্যাগ করেছিল কেন?

মেনকা পুনরায় ধীর স্বরে ব’ললে—সেই পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একজনকে ছেড়েছিলে বলেই তো আজ অনেকের জন্যে তোমায় ফিরে চাচ্ছি।...কোথায় যাবে তুমি? চেয়ে দেখ—বেদনায় বিশ্ব গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে,—

উমাচরণ থপ্ করে ব’সে পড়লো।

মেনকা তার পায়ের কাছে আনন্দর দেহটা আঁক্‌ড়ে শুয়ে পড়তেই, সদর দরজায় ভবতোষের গাড়ীখানা এসে লাগ্‌লো।

শেষ

৪। পরাজয়

সুপ্রসিদ্ধ সত্যেন বাবুর রচনা। ভাবের উজ্জ্বল লহরী; মনোমোহন।

৫। অদল বদল

স্বনাম-ধন্য প্রভাত বাবুর রস-রচনা কৌতূহলী পাঠকের নিত্যসাথী।

৬। রূপসী

মিষ্ট রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ব্যোমকেশ বাবুর সামাজিক সুরসাল উপন্যাস।

৭। চাঁদিনী

প্রখ্যাত-নামা প্রমথ বাবুর সামাজিক উপন্যাস। বাঙ্গালীর ঘরের কথা।

৮। রক্তের সম্বন্ধ

ভূতপূর্ব্ব বসুমতী সম্পাদক হেমেন্দ্র বাবুর অভূতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপন্যাস।

৯। পল্লী সতী

নলিনাক্ষ বাবুর অপূর্ব্ব রচনা। পল্লী-রমণীর রমণীয় কথা।

১০। মধু-মিলন

পূর্ণশশী দেবীর জনপ্রিয় সুললিত
সামাজিক উপন্যাস।

১১। ঢেউয়ের যাত্রী

মণীন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের
মৌলিক উপন্যাস।

১২। স্নেহময়ী

পূর্ণশশী দেবী প্রণীত। বাঙ্গালীর সংসারে
শান্তির সওগাত।

১৩। হীরের আংটী

প্রভাস বাবুর প্রেম-মাধুর্য্যে সমাহিত
সরস উপন্যাস।

১৪। হিঁদুর বউ

চরণ বাবু প্রেম মন্দাকিনীর বিচিত্র
প্রবাহ বহাইয়াছেন

১৫। মালাবদল

সুপ্রসিদ্ধ তিনকড়ি বাবুর নবন্যাস। ঘরে ঘরে
আনন্দ হিল্লোল।

দেব-সাহিত্য-কুটীর।

আট আনা সংস্করণের উপন্যাস রাজ

বহু রঙ্গীণ চিত্রে পরিশোভিত।

১। বাসন্তী

তুলসী বাবুর অমর তুলিকায় লেখা। প্রেমিক প্রেমিকার মনে চির বসন্ত-বাহার।

২। পূজার ফুল

সুসাহিত্যিক সুরেন্দ্রবাবুর মৌলিক রচনা। পূজার ফুল দেব-ভোগ্য, ভক্তের নির্ম্মাল্য।

৩। কাজলা রাতের বাঁশী

স্বনাম-ধন্য ব্যোমকেশ বাবুর রচনা। এ বাঁশী প্রেমের মন্দিরে চিরদিন বাজে।

৪। মুক্তির বাঁধন।

তিনকড়ি বাবুর রচনা। জটিল সামাজিক সমস্যার সরল মীমাংসা।

৫। সোণার হার

তুলসী বাবু বিরচিত। সোণার হার দুঃখের সংসার সোণার করিবে।